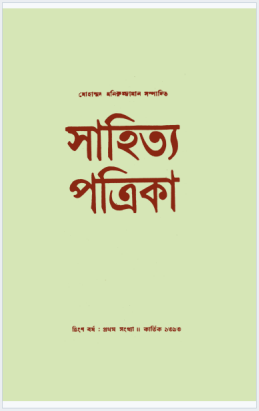

Vol. 30 | No. 1 | 1986

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

রমেশ শীল : পত্রগুচ্ছ

Volume	30
Issue	1
Year	1986
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Syed Mohammad Shahed
Published online	October 30, 1986
DOI	10.62328/sp.v30i1.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v30i1.4
Pages	139-186
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

রমেশ শীল : পত্রগুচ্ছ

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ

ভূমিকা

বাংলা কবিগানের বিকাশের ধারায় কবিয়াল রমেশ শীল একটি নতুন যুগের প্রবর্তক। লোককবিদের প্রতি সাহিত্য-গবেষকদের আপাত-অমনোযোগিতার কারণে এখন পর্যন্ত রমেশ শীলের পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন হয় নি, সত্য। তবে তাঁর রচনাবলী ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ ও পশ্চিম বঙ্গের সাহিত্য-সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।[১] অদূর ভবিষ্যতে রমেশ-চর্চা স্ফীতাকার হয়ে উঠবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ক. জীবন-পরিচয়[২]

রমেশ শীলের জন্ম বাংলা ১২৮৪ সনের (১৮৭৭ খ্রী.) ২৬ বৈশাখ, চট্টগ্রামের হাওলা অঞ্চলে—বর্তমানে যে-এলাকার পরিচয় বোয়ালখালী উপজেলার পূর্ব গোমদণ্ডী গ্রাম। পিতা চণ্ডীচরণ শীল ও মা শ্রীমতি রাজকুমারীর একমাত্র পুত্র-সন্তান তিনি, বাকী তিনজনই কন্যা। তাঁর পুরো নাম রমেশচন্দ্র শীল।

রমেশ-পরিবারের দীর্ঘকালীন পেশা কবিরাজী পদ্ধতিতে চিকিৎসা। রমেশ শীলের পিতা তাঁর বিয়ের পর পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য চলে আসেন শ্বশুরবাড়ী। সেখানে তিনি বংশগত পেশাই অব্যাহত রাখেন। রমেশ শীলের মাতামহ পেশাগত ভাবে ছিলেন ক্ষৌরকার। সামান্য কিছু জমিজমাও তাঁদের পরিবারের ছিল। তবে সব মিলিয়ে আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না, কোনরকমে খাওয়া-পরা চলত পরিবারটির।

সাত বছর বয়সে স্কুলে ভর্তি হন রমেশ শীল। কিন্তু এখনকার হিসেবে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ার সময়েই তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। স্কুলের

শিক্ষকেরা বিনাবেতনে তাঁর পড়ার ব্যবস্থা করে দেন। কিন্তু পিতৃহারা বালকের পক্ষে স্কুলের বই, স্কুলে যাওয়ার মত কাপড়, ইত্যাদি সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। ফলে রমেশ শীলের প্রাতিষ্ঠানিক লেখা-পড়ার এখানেই ইতি ঘটে।

স্কুলে পড়াকালীন সময়েই গান-বাজনার প্রতি রমেশ শীলের আগ্রহ সূচিত হয়। তাঁর পিতা তাঁকে এ-বিষয়ে উৎসাহিত করেন এবং কয়েকটি গানের বই কিনে দেন। রমেশ শীল তাঁর কয়েকজন সমবয়সীকে নিয়ে সন্ধ্যায় তরজা গানের আসর বসাতেন। কিন্তু পিতার অকাল মৃত্যুর ফলে (১৮৮৮) রমেশ শীলের এ-ধারায় জীবন-যাপন আর সম্ভব হয় না।

পরিবারের জন্য উপার্জনের প্রচেষ্টা চালাতে হয় বালককে। পরিবারের চরম আর্থিক অনটনের মধ্যে স্বভাবতই সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যবহারের অভাব ঘটে। একদিন মায়ের ওপর অভিমান করে বাড়ী ছেড়ে চলে যান রমেশ শীল। প্রথমে কয়েক মাইল দূরবর্তী শাকপুরা গ্রামে, সেখান থেকে সুদূর বার্মায়।

রমেশ শীলের বার্মা প্রবাসের কালপর্ব সাত বছর। তাঁর প্রবাসকালের কাজকর্ম সম্পর্কে এখন পর্যন্ত নির্দিষ্ট ভাবে কোন কিছু জানা যায়নি। তবে কারও কারও মতে তিনি সেখানে স্বর্ণকারের দোকানে কাজ করতেন। ১৮৯৫ সালে চট্টগ্রামে এক প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের সংবাদ পেয়ে রমেশ শীল বাড়ী ফিরে আসেন।

জীবনের এই পটপরিবর্তনের মধ্যেও গানের নেশা অব্যাহত ছিল রমেশ শীলের মনে। জন্মভূমিতে ফিরে এসে তাই আবার বিভিন্ন গানের আসরে যেতে শুরু করলেন তিনি। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য চট্টগ্রামের সদরঘাটে জগদ্ধাত্রী পূজোয় কবিগান শুনতে যাওয়া। এবং আকস্মিকভাবে এখানেই প্রথম কবিগানে অংশ নেন রমেশ শীল।

এটি সম্ভবত ১৮৯৮ সালের ঘটনা। সে-বছর সদরঘাটের জগদ্ধাত্রী পূজোর কবিগানে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন কবিয়াল চিন্তাহরণ আর মোহনবাঁশী। কবিগানের শুরুতেই হঠাৎ করে চিন্তাহরণের গলা ভেঙে গেলে আসরে স্বভাবতই বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়। অন্য কোন কবিয়ালকে তখনই পাওয়া সম্ভব নয়। এ-অবস্থায় রমেশ শীলের পূর্বপরিচিত কয়েকজন তরুণ জোর করে তাঁকে মঞ্চে উঠিয়ে দেন।

মঞ্চে উঠে প্রাথমিক অবস্থায় বিব্রত বোধ করলেও রমেশ শীল শেষ পর্যন্ত সেদিনের গানে প্রতিষ্ঠিত কবিয়াল মোহনবাঁশীকে পরাজিত করেন। এই ঘটনার পর তিনি কবিগানকেই পেশা হিসেবে বেছে নেন। কবিগানের প্রয়োজনে নতুন করে শুরু করেন অধ্যয়ন ও তর্কচর্চা।

তেইশ বছর বয়সে রমেশ শীল শ্রীমতি অপূর্ব বালার সঙ্গে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। প্রথম দিকে তাঁদের দাম্পত্য জীবন সুখের ছিল বলেই মনে হয়। কিন্তু কিছুদিন পরে অপূর্ব বালা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। ইতিমধ্যে তিনি একটি কন্যা সন্তানের জন্মদান করেন। অপূর্ব বালা দীর্ঘদিন পর অপ্রকৃতস্থ অবস্থাতেই মারা যান।

১৯২০ সালে রমেশ শীল শ্রীমতি অবলা বালাকে বিয়ে করেন। ধীরে ধীরে তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী রমেশ শীলের সকল কাজে সাধনসঙ্গিনীর আসন করে নেন। তাঁরা একজন কন্যা ও চারজন পুত্রের জনক-জননী হয়েছিলেন।

১৯২৩ সালে রমেশ শীল ঘটনাক্রমে চট্টগ্রামের নাজিরহাটের নিকট-বর্তী মাইজভাণ্ডারের পীরের দরবারে যান। মাইজভাণ্ডারের তৎকালীন পীরের দর্শন এবং দরবারের পরিবেশ তাঁকে মোহাবিষ্ট করে ফেলে। রমেশ শীলের মাইজভাণ্ডারী গান নামে পরিচিত মরমী সঙ্গীত রচনার এখানেই শুরু। এরপর যতদিন তিনি সুস্থ ছিলেন, কখনও মাইজভাণ্ডারের ওরসে অনুপস্থিত থাকেন নি।

তিরিশের দশকের শেষের দিকে রমেশ শীল কবিয়ালদের সংগঠিত করার উদ্যোগ নেন। ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত 'রমেশ-উদ্বোধন-কবিসংঘ' এ-প্রচেষ্টার ফসল। ১৯৪৩ সালে কবিসংঘকে পুনর্গঠন করে প্রতিষ্ঠা করা হয় 'জেলা কবি সমিতি'র।

চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি রমেশ শীল ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যপদ লাভ করেন। স্বকীয় রাজনৈতিক ও দার্শনিক চিন্তাধারার পাশা-পাশি কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে রমেশ শীলের এই সম্পর্ক আমৃত্যু অব্যাহত ছিল।

কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক স্থাপনের পর থেকেই চট্টগ্রামের বাইরে কবিগানের জন্য আমন্ত্রণ পেতে শুরু করেন রমেশ শীল। এ-পর্যায়ে তাঁর প্রথম কবিগান ১৯৪৫ সালে হাটগোবিন্দপুরে

অনুষ্ঠিত কৃষকসভার অষ্টম প্রাদেশিক সম্মেলনে। এর কয়েক-দিন পর 'নিখিল বঙ্গ প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী সম্মেলন' উপলক্ষে কলকাতার মোহাম্মদ আলী পার্কে অনুষ্ঠিত কবিগানে মুর্শিদাবাদের প্রখ্যাত কবিয়াল শেখ গোমানী দেওয়ান ও লম্বোদর চক্রবর্তীকে পরাস্ত করে তিনি কলকাতায়ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। এই বছরে রমেশ শীল কলকাতায় 'নিখিল বঙ্গ বন্দীমুক্তি কমিটি'র উদ্যোগে আয়োজিত দর্শনীর বিনিময়ে কবিগান, নেত্রকোণায় 'নিখিল ভারত কৃষক সম্মেলন'-এ কবিগান, চট্টগ্রামে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে কবিগান, প্রভৃতিতে অংশ নেন।

১৯৪৬ সালে কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় শহরের পাড়ায় পাড়ায় শেখ গোমানী সহযোগে শান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির লক্ষ্যে গান করেন রমেশ শীল। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠ আমৃত্যু সোচ্চার ছিল।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে দুটি রাষ্ট্র গঠিত হলে হিন্দু সম্প্র-দায়ভুক্ত অনেক পরিবার পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে পারি দেন। কিন্তু নানা প্রলোভনের মধ্যেও রমেশ শীল জন্মভূমি ত্যাগে রাজী হননি।

১৯৪৮ সালে কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে 'বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিয়াল'-এর পদক প্রদান করা হয় রমেশ শীলকে। ১৯৫২ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'নিখিল ভারত শান্তি সম্মেলন ও উৎসব'-এ যোগদান করেন তিনি।

এদিকে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রমেশ শীল তাঁর গান নিয়ে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ছুটে যান। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচারেও তিনি সক্রিয় অংশ নেন। কিন্তু এই বছরেই পূর্ব পাকিস্তানে গভর্নরের শাসন জারী করা হলে রমেশ শীলকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয়। প্রথমে তাঁকে চট্টগ্রাম জেলে এবং পরে ঢাকা জেলে বিনা বিচারে বন্দী করে রাখা হয়। ১৯৫৬ সালে অন্যান্য রাজবন্দীদের সঙ্গে তিনি মুক্তিলাভ করেন।

ইতিপূর্বে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ১৯৫৪ সালের পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে তিনি কবিগান পরিবেশন করেন। তিনি সম্মেলনের একটি অধিবেশনে সভাপতিত্বও করেন।

কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পর রমেশ শীল আবার কবিগান শুরু করেন। ১৯৫৭ সালে কাগমারীতে পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলনে কবিগান এ-পর্যায়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯৫৯ সালে পূর্ব পাকিস্তান সরকার তাঁকে মাসিক চল্লিশ টাকা হারে সরকারী ভাতা মঞ্জুর করেন। কিন্তু তার গণমুখী সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে রুষ্ট হয়ে সরকার ১৯৬২ সালে এই ভাতা প্রত্যাহার করেন এবং ইতিপূর্বে প্রদত্ত কয়েক মাসের টাকা ফেরত দাবী করেন।

১৯৬১ সালে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকীর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে রমেশ শীল সক্রিয় অংশ নেন।

পরের বছর ঢাকার বুলবুল ললিতকলা একাডেমী কবিয়ালকে সংবর্ধনা প্রদান করে। একই বছরে বাংলা একাডেমী তাঁকে সম্মান-সূচক এককালীন ভাতা দান করে। এ' বছরেই পাকিস্তান গ্রামোফোন কোম্পানী তাঁর গানের রেকর্ড বাজারজাত করে।

১৯৬৪ সালে চট্টগ্রামের মুসলিম ইনস্টিটিউটে রমেশ শীলকে তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ নাগরিক সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

শেষজীবনে রমেশ শীল গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। অভাব-অনটনের মধ্যে তাঁর চিকিৎসাও বার বার ব্যাহত হয়। অবশেষে ১৯৬৭ সালের ৬ই এপ্রিল তাঁর জীবনাবসান ঘটে। কবিয়ালের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর মরদেহ সমাধিস্থ করা হয়।

খ. কৃতি ও অবদান

উপরে উল্লেখিত রমেশ-জীবনের সংক্ষিপ্ত রূপরেখার সূত্র ধরে রমেশ শীলের সৃষ্টি এবং কবিগান ও কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা যেতে পারে।

কবিগান বাংলা লোকসাহিত্যের একটি প্রাচীন শাখা।[৩] আঠারো শতকের পূর্ব থেকেই তৎকালীন বঙ্গের বিভিন্ন পল্লীগ্রামে কবিগান যে-কোন আনন্দ উৎসবের অংশ স্বরূপ ছিল। সাহিত্যের ইতিহাস-রচয়িতাদের মতে কবিগানের স্বর্ণযুগ ১৭৬০ থেকে ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দ।

এর কাছাকাছি সময়েই কবিগান কলকাতার বাবু-সংস্কৃতির পৃষ্ঠ-পোষকতা লাভ করে। কবিগানে রুচির বিকৃতিও অনেকাংশে এই বিকৃতির ফল।

রমেশ শীলের কবিগান-চর্চার কালপর্ব প্রায় ষাট বছর। এই দীর্ঘ-সময়ে তিনি গতানুগতিকভাবে কবিগানের ধারাকে তাঁর গুরুর নিকট থেকে শিষ্যদলের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন, এমন নয়। বরং তার সক্রিয় প্রচেষ্টাতেই ঘটেছে কবিগানের পটপরিবর্তন, যুক্ত হয়েছে নতুন মাত্রা। বাংলা কবিগানের ধারায় কবিয়াল রমেশ শীলের অবদানকে দু'টি মূল স্তম্ভে স্থাপন করা যায়। যথা :

১. কবিগানের বিষয়বস্তুর পরিবর্তন ;
২. পরিবেশনা রীতি ও ক্ষেত্রের পরিবর্তন।

সাহিত্যের ইতিহাসে এ-তথ্য স্বীকৃত যে দীর্ঘকাল ধরে কবিগানে বিতর্কের বিষয়বস্তু ছিল হিন্দু পুরাণ ও মীথ্‌ভিত্তিক। কবিয়াল হরিচরণ আচার্য ও তাঁর শিষ্যরা কবিগানের বিষয়বস্তুতে স্বদেশপ্রেম যুক্ত করার প্রয়াস নিলেও এই বিষয়বস্তুর পরিবর্তন ঘটে মূলতঃ রমেশ শীলের প্রচেষ্টায়। নিম্নে উদাহরণস্বরূপ তৎকালে প্রচলিত কয়েকটি জনপ্রিয় 'দারা' এবং রমেশ শীল পরিবেশিত 'দারা' পাশাপাশি স্থাপন করে এই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা লাভ সম্ভব :

প্রচলিত 'দারা'	রমেশ শীলের 'দারা'
রাম—রাবণ	চাষী—মজুতদার
সূর্পণখা—মধুদৈত্য	কৃষক—জমিদার
বিন্ধ্যা— কৃষ্ণ	ধন—জ্ঞান
শক্ত—ভক্ত	ধন—বিজ্ঞান
ছন্দক—বুদ্ধদেব	একাল—সেকাল
কুরু—পাণ্ডব	যুদ্ধ—শান্তি
এজিদ—হোসেন	স্বৈরতন্ত্র—গণতন্ত্র
হানিফা—সোনাবানু	ধনতন্ত্র—সমাজতন্ত্র।

ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখেনা যে এভাবে রমেশ শীল বাংলা কবিগানে সাম্প্রতিক বিষয়কে টেনে নিয়ে আসেন, যার সঙ্গে আপামর জনতার

প্রতিদিনের জীবনের নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। ফলে কবিগান সমাজের বিভিন্ন স্তরের ও বিভিন্ন ধরনের মানুষের মাঝে জনপ্রিয়তা লাভ করে। দ্বিতীয়তঃ বিষয়বস্তুতে তিনি সমাজ-সচেতনতার চিহ্নবাহী নতুন মাত্রা সংযুক্ত করেন। আর কবিগানেও সমাজ-পরিবর্তনের বাণী উচ্চারণের ফলে শুধু বর্তমানেই নয়, আগামী কয়েক শতকেও কবিগান অপ্রাসঙ্গিক হিসেবে বিবেচিত হওয়ার আশংকা থেকে মুক্ত হয়। কবি-গানের বিকাশের ধারায় এই পরিবর্তন তর্কাতীতভাবেই বৈপ্লবিক।

কবিগানের উপস্থাপনা, ভাষা ও পরিবেশন-রীতির পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও রমেশ শীলের অবদান অতুলনীয়। প্রথমতঃ তিনি কবিগানের ভাষায় কয়েকশত বছর ধরে ব্যবহৃত অশ্লীল শব্দাবলীকে নির্বাসিত করেন। যুক্তি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বিকৃতি ও কুরুচিকে ত্যাগ করার পথও তিনি প্রদর্শন করেন।

দ্বিতীয়তঃ কবিগানের উপস্থাপনা-রীতিতে তিনি প্রাসঙ্গিকতার প্রতিষ্ঠা করেন। এখানেও রমেশ-পূর্ব রীতি ও রমেশ শীলের রীতিকে পাশাপাশি স্থাপন করে তাঁর বৈশিষ্ট্য নির্দেশ সম্ভব :

প্রাক-রমেশ-রীতি	রমেশ-রীতি
ভবানী-বন্দনা	স্বদেশ-বন্দনা
সখী-সংবাদ	গুণী-বন্দনা সভা-বন্দনা ইতিহাস-বর্ণনা
দেহতত্ত্ব ও শাস্ত্রগান (রং ও বোল পাঁচালী)	গণসঙ্গীত

এভাবে কবিগানে প্রকরণ ও উপস্থাপনা রীতিতে রমেশ শীল অতুলনীয় পরিবর্তন সাধন করেন।

তৃতীয়তঃ কবিগানের পরিবেশনা-রীতিতেও রমেশ শীল পরিবর্তন সাধন করেন। উল্লেখ্য যে, কবিগান পরিবেশনের সময় গায়ক ও দোহারগণ অনেকটা নৃত্যভঙ্গীতে মঞ্চে বিচরণ করেন। আঠারো-উনিশ শতকে এই নৃত্য অশ্লীল খেমটা নৃত্যে রূপান্তরিত হয়। অনেক কবিদলে

নর্তকীর ব্যবহার পর্যন্ত সূচিত হয়। বিশ শতকে এসে রমেশ শীলের প্রচেষ্টায় কবিগানের পরিবেশনা-রীতির এই অশ্লীলতা দূরীভূত হয়।

রমেশ শীল-প্রতিভার আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক এই যে, সৃজন-শীল-মানসের পাশাপাশি তাঁর ছিল সাংগঠনিক ব্যক্তিত্বও।[৪] ফলে কবিগানের ধারায় তাঁর সূচিত পরিবর্তনকে তিনি পূর্ববঙ্গের সকল কবি-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রসারিত করেন। পশ্চিম-বঙ্গেও ক্রমশঃ এ-সকল পরিবর্তনের ব্যাপক প্রভাব পড়ে।

কবিগানের বাইরে রমেশ শীল রচিত খণ্ড-কবিতার সংখ্যা সহস্রাধিক হবে বলেই অনুমিত হয়। এর মধ্যে কবিয়ালের জীবনকালে মুদ্রিত মোট ২২টি পুস্তকে প্রায় ছয়শত খণ্ড-কবিতা প্রকাশিত হয়েছে।[৫] বাংলাদেশ ও পশ্চিম-বঙ্গ থেকে প্রকাশিত রমেশ শীল-কেন্দ্রিক সংকলন-সমূহে তাঁর কিছু অপ্রকাশিত কবিতাও মুদ্রিত হয়েছে।[৬] কবিয়ালের পাণ্ডুলিপি থেকে উদ্ধারকৃত অর্ধশত অগ্রন্থিত কবিতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'সাহিত্য পত্রিকায়'[৭]য় এবং অর্ধশত অপ্রকাশিত কবিতা চট্টগ্রাম বিশ্ব-বিদ্যালয়ের 'পাণ্ডুলিপি'[৮]তে কিছুদিন পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। কবিয়ালের জীবিতকালে দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মুদ্রিত বহুসংখ্য খণ্ড-কবিতা অগ্রন্থিত ও অবিন্যস্ত অবস্থায় রয়ে গেছে। এ-ছাড়াও রমেশ শীলের কয়েকশত অপ্রকাশিত কবিতার পাণ্ডুলিপি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভস্মীভূত হয়ে যায়।

প্রকাশিত খণ্ড-কবিতাসমূহের বিচারেও বাংলা লোক-কবিদের তালিকায় রমেশ শীল উচ্চস্থান লাভ করতে পারেন। আমাদের বিবে-চনায় তাঁর খণ্ড-কবিতাবলীকে চারটি অংশে বিন্যস্ত করা যায়:

১. মরমী;
২. দেশাত্মবোধক;
৩. লোককাব্য;
৪. বিবিধ।

রমেশ শীলের প্রকাশিত মরমী গানের সংখ্যা প্রায় অর্ধ-সহস্র। এর অধিকাংশই মাইজভাণ্ডারের পীরের উদ্দেশে রচিত; কয়েকটি কবিতা কাউখালীর পীর ও সাতগাছিয়ার সুলতানপুরীকে নিবেদিত। এ-ছাড়া

রাধাকৃষ্ণবিষয়ক গানের একটি সংকলনও প্রকাশ করেছিলেন তিনি। রমেশ শীলের মরমী গানের মূল ভাব সকল ধর্মীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে থেকে মানবধর্মের জয়গান ঘোষণা। বাংলা মরমী গানের ধারায় রমেশ শীল রচিত ভাণ্ডারী গান একটি জনপ্রিয় সংযোজন।

রমেশ শীল রচিত প্রকাশিত দেশাত্মবোধক কবিতার সংখ্যা শতাধিক। ১৯০৬ থেকে ৬৯ সালের মধ্যে এ-সকল কবিতা রচিত। এই কবিতাবলীর মধ্যে রয়েছে স্বদেশী আন্দোলন, রেল ধর্মঘট, অসহযোগ আন্দোলন, প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, খেলাফত আন্দোলন, চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ, মন্বন্তর, পাকিস্তান আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন প্রভৃতির কাহিনী এবং কৃষক-শ্রমিকের মুক্তি, গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্রের জয়গান, আন্তর্জাতিকতা ও অসাম্প্রদায়িকতার আহ্বান ইত্যাদি বাণী। কোন লোককবির পক্ষে এ-ধরনের ইতিহাস-চেতনা ও গণমুখিতা নিঃসন্দেহে দুর্লভ।

রমেশ শীল রচিত লোককবিতাসমূহ মূলতঃ আঞ্চলিক গান। এই জনপ্রিয় রচনাসমূহের মূল বৈশিষ্ট্য এর গণমুখী বিষয়।

রমেশ শীলের বিবিধ কবিতার মধ্যে রয়েছে আত্মজীবনীমূলক ও ব্যঙ্গাত্মক কবিতা। এ-সকল কবিতায়ও কবিয়ালের নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রয়েছে।

খণ্ড-কবিতার জন্য রমেশ শীল বাংলা কবিতার ধারায় ক্রমশঃ উচ্চস্থান লাভ করবেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমাদের মতে তাঁর স্থান লালন শাহ–মুকুন্দ দাস—হাসন রাজার সঙ্গেই নির্দিষ্ট হবে।

গ. পত্র-প্রসঙ্গ

বর্তমান নিবন্ধে কবিয়াল রমেশ শীলের মোট সতেরটি পত্র ও একটি আবেদন সংকলন করা হয়েছে। এর মধ্যে দুটি পত্র তাঁর সন্তানদের উদ্দেশ্যে, নয়টি মাহমুদ নুরুল হুদার উদ্দেশ্যে, একটি কাজী মোতাহার হোসেনের উদ্দেশ্যে, একটি আবদুর রশীদের উদ্দেশ্যে, একটি শেখ মুজিবর রহমানের উদ্দেশ্যে এবং তিনটি সুনীল চক্রবর্তীর উদ্দেশ্যে লিখিত।

সংকলিত প্রথম দুটি পত্র রমেশ-মানস আলোচনায় অপরিহার্য দলিল রূপে বিবেচিত হওয়ার দাবী রাখে। সাধারণতঃ মানুষ মৃত্যু নিকটবর্তী এ-রকমের সময়েই 'ওসায়িতনামা' জাতীয় এ-ধরনের পত্র লিখে থাকে। রুলটানা কাগজের পর পর দু'পাতায় লেখা এই পত্রদ্বয়ের লেখার তারিখ ৪ মে ১৯৪৮। এর কাছাকাছি সময়ে রমেশ শীল অসুস্থ ছিলেন, এমন কোন তথ্য আমাদের নিকট নেই। তবে এর পূর্ববর্তী বছরে ভারত-বিভক্তির ফলে রমেশ শীলের হিন্দু প্রতিবেশীরা জন্মভূমি ছেড়ে ভারতে পাড়ি জমালে, তৎকালীন পরিবেশে রমেশ শীলের বিষণ্ণ মনে মৃত্যুচিন্তা জাগ্রত হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

পত্রদ্বয়ের প্রথমটিতে রমেশ শীলের পরিবার-সংক্রান্ত ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। এই পত্রে তিনি নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেছেন :

ক. সহোদরদের মধ্যে সদ্ভাব রক্ষা করে সম্ভব হলে যৌথ পরিবারে বাস করা : নতুবা সমঝোতার মাধ্যমে পৃথক হয়ে যাওয়া : তবে পৃথকে অশান্তি ডেকে আনবে।

খ. ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদান করা।

গ. মানুষের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রাখা ; ভদ্র, নম্র, সদাচারী হওয়া।

ঘ. জ্যেষ্ঠ সহোদরের সহনশীল হওয়া।

ঙ. বৃদ্ধা মাতার যত্ন নেওয়া।

বুঝতে অসুবিধে হয় না যে রমেশ শীল বঙ্গের ঐতিহ্যবাহী যৌথ-পরিবারের ধ্যান-ধারণাকেই লালন করতেন।

সংকলিত দ্বিতীয় পত্রটি রমেশ শীলের ধর্মবিশ্বাস-সংক্রান্ত আলোচনার একটি অমূল্য উপাদান। শীল সম্প্রদায়ের রীতি অনুযায়ী রমেশ শীলের মৃতদেহ চিতায় অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত করাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু রমেশ শীলের আলোচ্য পত্রে তাঁকে যে ভাবে সমাধিস্থ করার নির্দেশ দিয়েছেন, তা যোগীপুরুষদের সমাধিস্থ করার রীতির সঙ্গে অভিন্ন। এই পত্র থেকে অনুমিত হয় যে, কবিয়ালের ধর্মবিশ্বাস রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখের অনুগামী ছিল। তাঁদের ধর্মচিন্তার মূলকথা ছিল, 'সব ধর্মই সত্য, যত মত তত পথ'।

এই ধর্মচিন্তায় আনুষ্ঠানিকতার স্থান ছিল স্বল্প, সংকীর্ণতা ছিল পরিহার্য। পত্রে উল্লেখিত গংগাগির, বালকসাধু, জ্যোতিষানন্দ প্রমুখও ছিলেন একই পথের পথিক। সর্ব ধর্মের সমন্বয়বাদী এ-ধরনের চিন্তার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে রমেশ শীলের মরমী রচনা ও ধর্মচর্চার মূলভাবটি সুপ্ত রয়েছে।

রমেশ শীলের মরমী রচনায় নসু মালুম, মাইজভাণ্ডারের পীর, কাউখালীর পীর, সুলতানপুরী প্রমুখের বন্দনা দেখা যায়। বাহ্যিক বিচারে এঁরা সকলেই মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত। পাশাপাশি রমেশ শীলের মরমী রচনায় রয়েছে রাধা-কৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, গৌতম বুদ্ধ প্রমুখের স্তুতি। রমেশ শীলের মধ্যে সর্বধর্ম সমন্বয়বাদী ভাব থাকার ফলেই বঙ্গের বিভিন্ন ধর্মের মহাপুরুষদের বন্দনা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে। উল্লেখ্য যে, তাঁর বন্দিত মহাপুরুষদের সকলেই প্রায় অনানুষ্ঠানিক ধর্ম চর্চা-পন্থী।

বুলবুল ললিতকলা একাডেমীর সঙ্গে রমেশ শীলের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হয় একাডেমী কর্তৃক ১৯৬১ সালে আয়োজিত 'লোকসঙ্গীত ও শিল্প উৎসব'কালীন সময়ে। এই উৎসবে রমেশ শীল তাঁর সহযোগী-দের নিয়ে কবিগানে অংশগ্রহণ করেন। পরের বছর তিনি বুলবুল ললিত কলা একাডেমীর সপ্তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এ-সময়ে তাঁকে বাফা এক সংবর্ধনা প্রদান করে। শারীরিক অসুস্থতার কারণে যাত্রা শুরু করেও তিনি একাডেমীর অষ্টম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর (১৯৬৩) অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ব্যর্থ হন। বাফার সঙ্গে কবিয়ালের এই সম্পর্ক আমৃত্যু ব্যাহত হয়নি।

সংকলিত ৩ থেকে ১১ সংখ্যক পত্রসমূহ এই পর্বের স্মৃতিবাহী। বাফার তৎকালীন সম্পাদক মাহমুদ নূরুল হুদাকে লিখিত এ-সকল পত্রে রমেশ-পরিবারের আর্থিক দুরবস্থার ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায়। রমেশ শীলের শেষ জীবনের ভগ্নস্বাস্থ্য, রোগ এবং চিকিৎসায় আর্থিক অসামর্থ্যের বিষয়েও এ-সকল পত্র থেকে আমরা অবগত হতে পারি। এর সঙ্গে রয়েছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে তাঁদের পরিবারের অসহায় অবস্থার চিত্র।

রমেশ রচনাবলীর দেশাত্মবোধক ও লোককাব্যের অংশে এই দুর্ভাগ্য-জনক চিত্রের প্রতিফলন রয়েছে। কিন্তু সেখানে রমেশ শীল এই

বেদনাকে বর্ণনা করেছেন সাধারণ মানুষের বেদনা রূপে। কেননা তাঁর বিশ্বাস ছিল সমাজের সামগ্রিক পরিবর্তনে, ব্যক্তিগত উন্নতিসাধনে নয়। রমেশ-প্রতিভায় এই বোধটি নিঃসন্দেহে সার্থক শিল্পীসত্তার চিহ্নবাহী।

কাজী মোতাহার হোসেনের সঙ্গে রমেশ শীলের ঘনিষ্ঠতা জন্ম ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানের সময়। এ-পর্যায়ে রমেশ শীল ও কাজী মোতাহার হোসেন, চট্টগ্রামে বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানে একই সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। সংকলিত দ্বাদশতম পত্রটি তারই সূত্র ধরে লিখিত। এই পত্রেও রমেশ শীলের আর্থিক দুরবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়

ত্রয়োদশতম পত্রটি চট্টগ্রাম শহরের ডাক্তার আবদুর রশীদকে লিখিত ১৯৬৩ সালে রমেশ শীল গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে চট্টগ্রাম শহরে তাঁর জন্য সাহায্য কমিটি গঠন করে চাঁদা উঠানো হয়। এই পত্রেও রমেশ শীলের আর্থিক দুরবস্থা ও অসুস্থতার অকরুণ চিত্র পাওয়া যায়।

সমাজ-সচেতন কবিয়াল রমেশ শীলের রাজনৈতিক যোগাযোগ ছিল মূলতঃ তৎকালীন বামপন্থীদের সঙ্গে। তবে তৎকালীন আওয়ামী লীগের সঙ্গে বহু সংগ্রাম-আন্দোলনে যৌথ ভাবে অংশ নেয়ার কারণে লীগ নেতৃবৃন্দের সাথেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গেও রমেশ শীলের সুসম্পর্ক ছিল। কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলনের সূত্রে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সঙ্গেও রমেশ শীলের ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠে। আলোচ্য পত্র এই রাজনৈতিক যোগাযোগের চিহ্নবাহী। রমেশ-পরিবারের আর্থিক দুরবস্থার চিত্র এই পত্রেও বিধৃত।

সংকলিত পনের থেকে সতের সংখ্যক পত্র রমেশ শীলের জীবন-পরিচয়মূলক। সম্ভবতঃ কলকাতা থেকে অধ্যাপক সুনীল চক্রবর্তী কবিয়ালের জীবন সম্পর্কে তথ্য জানতে চাইলে রমেশ শীল এই পত্রত্রয় প্রেরণ করেন। কয়েক মাস সময়ের মধ্যে লেখা এই পত্র তিনটি প্রকৃতপক্ষেএকটি সূত্রে গাঁথা।

প্রথম পত্রে (পনের সংখ্যক পত্র) কবিয়ালের পিতৃ-পরিচয়, বাল্য-কালের অবস্থা এবং প্রথম কবিগানে অংশগ্রহণ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ

তথ্য রয়েছে। রমেশ শীল সম্পর্কে লিখিত পূর্ণেন্দু দস্তিদার, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াসকৃত রচনা সম্পর্কে কবিয়ালের ইতিবাচক দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিচয়ও এই পত্রে সুস্পষ্ট।

দ্বিতীয় পত্রেও (ষোল সংখ্যক পত্র) রমেশ শীলের বাল্যজীবন, প্রথম কবিগানের অভিজ্ঞতা, প্রথম মাইজভাণ্ডার যাওয়ার অভিজ্ঞতা প্রভৃতির পরিচয় আছে। তবে এই পত্রে বর্ণিত কবিয়ালের মাইজভাণ্ডার যাওয়ার পটভূমির সঙ্গে তাঁর 'আলেকবাবা'র নিবেদনের কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই পত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ তিরিশ ও চল্লিশের দশকে কবিয়ালদের সংগঠিত করার পটভূমি বর্ণনা।

সর্বশেষ পত্রে রমেশ শীলের প্রথম জীবনের কবিগান-চর্চার চিত্র বিধৃত। তাঁর বিবাহিত জীবন, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি সম্পর্কে কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও এই পত্রে রয়েছে। কবিয়ালের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর অনেক গান প্রকাশিত হয়নি, এ-ধরনের একটি বেদনাদায়ক মন্তব্যও এই পত্রে রয়েছে।

পরিশিষ্টে রমেশ শীলের একটি 'আবেদন' সংযুক্ত করা হয়েছে। পূর্ববঙ্গ কবিগানের বিকাশের কয়েকটি সূত্র এই আবেদনে পাওয়া যায়। আবেদনটি কবিগানের প্রতি রমেশ শীলের অকৃত্রিম ভালবাসার চিহ্নবাহী।

কবিয়াল রমেশ শীলের লিখিত এ-সকল পত্র বহুমাত্রিক গুরুত্ব বহন করে। তার উল্লেখযোগ্য মাত্রাসমূহকে সূত্রাকারে নিম্নোক্তভাবে স্থাপন করা যেতে পারে :

ক. পত্রসমূহে রমেশ শীলের জীবন-সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য তথ্য রয়েছে, যার বেশ কয়েকটি ইতিপূর্বে তাঁর জীবনীসমূহে উল্লেখিত হয়নি ;

খ. পত্রে রমেশ-মানসের সুস্পষ্ট পরিচয় রয়েছে ; তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাস, রাজনৈতিক-সামাজিক-পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গী এখানে চিত্রিত হয়েছে ;

গ. কবিয়ালের কয়েকটি রচনার পটভূমি ও পরিপ্রেক্ষিত পত্রে বিধৃত হয়েছে ;

ঘ. পত্রে কবিগানের বিকাশ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ও গুরুত্ব-পূর্ণ ইঙ্গিত রয়েছে ;

ঙ. রমেশ শীলের মুদ্রিত পদ্যের সংখ্যা অনেক হলেও তাঁর কোন মুদ্রিত গদ্য নেই, তাই এই পত্রাবলী তাঁর গদ্যের উদাহরণ হিসেবেও মূল্যবান।

রমেশ-চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে আদৃত হবে, এই বিশ্বাস থেকেই রমেশ শীলের পত্রাবলীর এই গুচ্ছটি এখানে মুদ্রণ করা হল।

প্রসঙ্গতঃ এখানে সংকলিত পত্রসমূহ আমি গত অর্ধযুগে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করেছি। সংকলিত প্রথম দুটি পত্রের অনুলিপি লাভ করেছি চট্টগ্রামের বিশিষ্ট সাংবাদিক অরুণ দাশগুপ্তের সৌজন্যে। বুলবুল ললিতকলা একাডেমীর (বাফা) সম্পাদককে লিখিত নয়টি পত্র বাফার সংরক্ষিত রেকর্ড থেকে প্রতিষ্ঠানের সহকারী রেজিস্ট্রার ধীরেন মিত্রের সহযোগিতায় অনুলিপি করা হয়েছে। সুনীল চক্রবর্তীকে লিখিত পত্রত্রয় ইতিমধ্যেই মুদ্রিত হয়েছে। অবশিষ্ট তিনটি পত্র ও 'আবেদন' রমেশ শীলের পারিবারিক সূত্র থেকে সংগৃহীত। এই সুযোগে আমি তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

সংকলিত পত্রসমূহের অধিকাংশই মূল পত্র থেকে অনুলিপিকৃত, তবে প্রথম দুটি পত্র মূল পত্রের ফটোকপি থেকে এবং শেষ তিনটি পত্র মুদ্রিত পাঠ থেকে অনুলিপিকৃত। অনুলিপি তৈরীর সময় বানান সংশোধন ব্যতীত পত্রের আর কোনরকম সংশোধন করা হয় নি। দু'একটি পত্রে মূল লেখায় অস্পষ্টতা থাকায় অনুমানের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে স্বভাবতই।

পত্রগুচ্ছ

ক. সন্তানদের কাছে লেখা

পত্র : এক

ছেলেদের প্রতি,

তোমরা মিলেমিশে একত্রে থাকিলে তোমাদের মংগল হবে। আর যদি পারা না যায় ঝগড়াঝাটি ছাড়া পৃথক হয়ে যেও। তোমাদের ছেলেমেয়ে পড়াশুনা করে মত, নতুবা আমি যেমন অনুতাপভোগী তোমরাও শেষে মনোকষ্টে কাল কাটাতে হবে। লোকে বলে বিদ্যাকে যমে ডরায়। আমার জীবনে শত্রুরা সমাজে কি ব্যবহারে আমাকে কষ্ট দিবার চেষ্টা করে তারা কষ্ট পেয়েছে। গুরুদেব আমায় সম্মান দিয়েছে। কোন কথা মনে রেখো অন্যকে জানতে দেওয়া ভাল নয়, অন্যে জানিলে বাধা ঘটায়। লোকের সংগে যত সদ্ভাব রাখতে পার তত সুখ আছে। জনপ্রিয়তা বড় কথা।

বড় ভাই সহনশীল না হলে পরিবার ভেঙ্গে যায়। নম্রতা, ভদ্রতা, সদাচার মূর্খকেও জ্ঞানী, অসৎকে সৎ করে। তোমাদের মা চিরদুখিনী হয়ে রইল। মরুক বাচুক তোমাদের সেই দিগ দিশিট নাই। শেষ-কালে আর লাঞ্ছনা দিও না। গায়ে বল চিরদিন সমান থাকে না। তোমরা যদি যোগে থাক সুখ সম্মান পাবে। পৃথকে অশান্তি ডেকে আনবে।

আমি জীবনপাত করে বুঝালাম, তবু উগ্র মেজাজি হয়ে মান নাই। আমার কর্তব্য আমি করেছি ... মত তোমরা শেষে বুঝবে। রোজগার কোন ... হয় মালিকে জানে।

১৯৪৮।

পত্র : দুই

মরণ সংবাদ

আমার মরণ পর অন্য জায়গা না মিলিলে গোয়ালঘরের দক্ষিণ দিয়া সমাধি করিও। যে যাই বলুক কারও কথা শুনিও না। সাধু

অসাধু তা আমি জানি। সাধু আকাশ হতে পড়ে না। মাছ মাংস খেয়ে সংসারে থেকে সাধু হওয়া যায়। বেশীরভাগ নায়করা সাধু-সকল মুনিরা মাংসভোজী ছিলেন—রামকৃষ্ণ পরমহংস, মনমোহন, রামপ্রসাদ, বিবেকানন্দ ইত্যাদি। আমার গুরুদেবও আমিষভোজী ছিলেন। তিনি আমাকেও আদেশ দিয়াছিলেন, স্বামীজী সর্বলোক বিদিত।

আমার মৃত্যুর পর তোমরা সামাজিক মতে উত্তরি নিও। ক্রিয়া যদি পার চতুষ্প্রহর কির্তন আর অন্নজল ক্রিয়া করিও। আমি সাধু কি অসাধু তার বিচারে তোমাদের অধিকার নাই। আমার জীবনগতি আমি ঠিক করেছি। গেরুয়া পরা খাদ্য বিচার ব্যবসার জন্য, শাদা কাপড় ধুতিতে সাধনার বাধা দিতে পারে না। আমার পূর্বপুরুষের নাম বই বিক্রীর শেষ পৃষ্ঠায় আছে। দরকার হলে দেখ।

আমার কথা তোমরা যদি পালিতে অক্ষম তবে আমার দেহটি গংগাভাসা করিও। কারও কথা শুনিও না। আমার কথা আমি জানি আর জানতে হলে গংগাগির, বালক সাধু, জ্যোতির্ময়ানন্দকে জিজ্ঞাসা করলে বুঝবে।

১৯৪৮ ইং ৪ মে
শ্রী রমেশচন্দ্র শীল

খ. মাহমুদ নুরুল হুদাকে লেখা

পত্র : তিন

১৩-২-৬২
গোমদণ্ডী

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়
বুলবুল একাডেমী, ঢাকা

অগ্রে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা নেবেন

লোকসঙ্গীত ও শিল্প উৎসব উপলক্ষে আমার ছেলে যজ্ঞেশ্বরকে আমার জন্য ১০০৲ একশত টাকা মিষ্টি খেতে দিয়েছেন, তাই আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি নিজের ইচ্ছামত মিষ্টি খেয়েছি। এই

আর্থিক দুর্দিনে আপনার সাহায্যটুকু পেয়ে মনে লোকসঙ্গীতের নূতন জোয়ার ছুটল। এই বৃদ্ধ বয়সে সঙ্গীতের মিষ্টি রসে মন ভরপুর হয়েছে।

আশা করি ভবিষ্যতে আমাকে মিষ্টি খাওয়াতে ভুলবেন না।

ধন্যবাদ

অভিনন্দন রইলো
ইতি---
আপনাদেরই
কবি রমেশ চন্দ্র শীল

পত্র : চার

গোমদণ্ডী, চট্টগ্রাম
৭-৩-৬২

প্রীতিভাজনেষু,

আমার নমস্কার ও গভীর শ্রদ্ধা নিবেন।

আপনার ২২-২-৬২ তারিখের চিঠি পেয়েছি। আগামী পয়লা জুলাই বুলবুল একাডেমীর প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে যে অনুষ্ঠান হবে, তাতে আমাকে উপস্থিত থাকবার জন্য আমন্ত্রণ পাঠাবেন, সেই জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করি আপনাদের উৎসবে যোগদান করব। মনের খুব জোর আছে।

সেখানকার আর্ট কাউন্সিলের সম্পাদককে আমার জন্য এককালীন ভাতা মঞ্জুর করার জন্য অনুরোধ করেছেন, তাতে আপনার কাছে গভীর ভাবে কৃতজ্ঞ। আপনার মত দরদী ও হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির কাছে আমার আর্থিক দুরবস্থার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। বুলবুল একাডেমীর পক্ষ থেকে আপনার অকৃত্রিম সহানুভূতি ও সক্রিয় সাহায্য জীবনে কখনও ভুলবার নয়।

আশা করি ভাল আছেন।

অভিনন্দন রইলো
ইতি
আপনাদেরই
কবি রমেশ চন্দ্র শীল

পত্র : পাঁচ

গোমদণ্ডী
১১-৬-৬২

প্রীতিভাজনেষু
নুরুল হুদা সাহেব,

আমার আদাব নিবেন।
আপনার প্রেরিত চিঠিখানা পেয়েছি। আমার জন্য আপনার অনুরাগ, তাতে বিশেষ সন্তুষ্ট হলাম। আপনার মত দরদী ও হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি ব্যতীত আমার দরদ আর কেহ বুঝবে না। আপনার অকৃত্রিম সহানুভূতি কখনও ভুলবার নয়।

আগামী পহেলা জুলাই বাফার সপ্তম প্রতিষ্ঠা দিবসে আমার ছেলেসহ আমাকে ঢাকা যাওয়ার জন্য আহ্বান করেছেন। আশা করি এই উৎসবে যোগদান করব।

উৎসবে কবিগানের আসর হবে কিনা জানাবেন। যদি কবিগানের ব্যবস্থা করেন, তা হইলে এখানের কবির দল যেতে হবে কিনা জানাবেন। আমি ও আমার ছেলে যোগদান করতে প্রস্তুত আছি।

উৎসবে আপনারা আমাকে বিশেষ করে সম্মানিত করবেন শুনে বিশেষ আনন্দিত হলাম এবং আপনাদিগকে ধনাবাদ জানাচ্ছি।

প্রীতি রইলো

ইতি
আপনাদেরই
কবিয়াল রমেশ শীল

পত্র : ছয়

গোমদণ্ডী
২১-৬-৬২

সেক্রেটারী সাহেব,

আপনার প্রেরিত টেলিগ্রামখানা আজ বৈকালে পেয়েছি। টেলিগ্রাম পাওয়ার ২ ঘন্টা আগে একটা চিঠি আপনার নিকট পোস্ট করেছি। বোধ হয় পেয়েছেন।

১লা জুলাই আপনাদের উৎসবে আমি ও আমার ছেলে যোগদান করতে প্রস্তুত আছি। আপনাদের খবর পেলে ৩০শে জুন রওনা করব। আমি এক প্রকার ভাল আছি।

আপনাদের টেলিগ্রাম বা চিঠি পেলে যাত্রা করব।

ইতি
আপনাদের
কবিয়াল রমেশ শীল

পুঃ : সাত

গোমদণ্ডী
১০-৭-৬২

শ্রদ্ধান্তে নিবেদন,

আপনাদের থেকে বিদায় নিয়ে শুক্রবার নয়টার বাড়ী পৌঁচেছি। আমাদের দেশের ছাত্র যুবকেরা বাফার কথা নিয়ে খুব আলোচনা করছে। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে যাহা আসে বলেছি এবং সেই পাঁচদিন যেই পরিবেশে কাটিয়েছি, দেহে প্রাণ যতদিন আছে ততদিন ভুলবার নয়। খালেক, তুলসি, দেলোয়ারদের কথা মুহ মুহ মনে পরে। যা কিছু দেখে এলাম, বাফার সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

পূর্ব পাকিস্তানের সংস্কৃতির উন্নতি একমাত্র বাফার মাধ্যমে হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। শিল্পীরাও সৃজনশীল মনোভাব নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। বাফা একদিন বিশ্বদরবারে সংস্কৃতিমিশন রূপে স্বীকৃতি লাভ করবে, তাতে সন্দেহ নেই। আপনাদের নিকট হতে যে সম্মান লাভ করেছি, তা আমার জীবনের প্রধন।

ঢাকার ডি. পি. আই. শুনলাম নোয়াখালীর লোক আপনার পরিচিত, আমার ভাতা সম্বন্ধে দরখাস্ত করেছি। আপনি একটু কষ্ট স্বীকার করে আলাপ করে দেখবেন, বোধ হয় বিফল হবে না।

আমার আর্থিক অবস্থা আপনার অবিদিত নয়, ভাতা পুনঃ বহাল সম্বন্ধে তদ্বির করে এমন দরদী ঢাকায় আপনি ভিন্ন কেহ নাই। মাইজ-

ভাণ্ডারী ও সামাজিক গানের বই বা পল্লীগীতি রচনা দরকার হলে পত্রযোগে জানাবেন। আমি পাঠিয়ে দেব।

প্রীতি রইলো

ইতি
আপনার চিরানুগত
কবি রমেশ চন্দ্র শীল

পত্র : আট

গোমদণ্ডী
৩-৬-৬৩

নূরুল হুদা সাহেব,

আমার আদাব নিবেন।

আশা করি ভালই আছেন। আপনার নিকট চিঠি লিখতে অনেক দেরী হয়ে গেল। গত ২৮শে মে দিনগত রাত্রে যে সর্বনাশা ঘূর্ণিবাত্যা চট্টগ্রামের বুকের উপর দিয়ে বহে গেল তার তন্নাবহ দৃশ্য সত্যিই মর্মান্তিক। আমরা কোন রকমে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি। কিন্তু সমস্ত ঘরের চাল উড়ে গেছে। থাকার ঘরটার ছাউনি উড়ে গিয়ে ছাড়খার হয়ে গেছে। বর্তমানে বৃষ্টির দিনে ঘরে থাকার অবস্থা নেই।

কোন রকমে দেওয়ালের টিনগুলি ঝাগিয়ে দিয়েছি। রান্নাঘর, ঢেউরি ঘর, গরুর ঘর সব ভেঙ্গে গেছে। আর গাছগাছালি কত ভেঙ্গে নষ্ট হয়ে গেছে তার কোন হিসেব নেই।

এখন নিরুপায় হয়ে বসে আছি। সমস্ত জিনিসের দাম জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার উর্ধ্বে উঠে গেছে। এখন কি ভাত খাব, না ঘরের ছাউনি দিব, ভেবে চিন্তে কুল পাচ্ছি না।

এই ঘূর্ণিবাত্যায় আমাদের হাজার টাকার মত ক্ষতি হয়ে গেছে। সামনে বর্ষা এসেছে। ছেলেরা যা রোজগার করে তাতে দুই বেলা অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা হয় না। তার উপর প্রকৃতির তাণ্ডবলীলায়

একেবারে ধ্বংস হয়ে গেলাম। আমার অবস্থার কথা বুঝবার আপনি ছাড়া আর কেউ নেই।

প্রীতি রইল

ইতি
আপনাদেরই কবিয়াল
শ্রী রমেশ চন্দ্র শীল

সত্র : নয়

গোমদণ্ডী
১৮-৬-৬৭

নুরুল হুদা সাহেব,

অগ্রে আমার আদাব নিবেন।

আপনার চিঠিখানা পেয়েছি। আর্ট কাউন্সিলের নিকট আপনার ঠিকানায় দরখাস্ত পাঠিয়েছি, বোধ হয় পেয়েছেন। আগামী ১লা জুলাই বাফার সম্মেলনে যোগদান করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি। ৩০শে জুন চট্টগ্রাম থেকে গ্রীন এরো ট্রেনে ঢাকা রওনা হব এবং রাত্রে ঢাকায় এসে পৌঁছব। ভাড়ার টাকা টেলিগ্রাম মানি অর্ডার করে পাঠাবেন।

বর্তমানে খুব বৃষ্টি হতেছে। আমার একটি ঘরের দেওয়াল ধসিয়া পড়ে গিয়েছে। কি করব প্রকৃতির লীলা !

আমি ও আমার ছেলে ৩০ তাং ১২॥০টায় গ্রীনএরো ট্রেনে ঢাকায় রওনা হব।

ইতি
আপনাদেরই
কবিয়াল রমেশ চন্দ্র শীল

পত্র : দশ

গোমদণ্ডী
৩০-৭-৬৩

প্রীতিভাজনেষু
নুরুল হুদা সাহেব,
আমার আদাব নিবেন।

বহুদিন পর রোগশয্যায় বসে আপনার নিকট লিখতেছি। রোগের কোন গতি পরিবর্তন দেখা যায় না। শহরের একজন নামকরা ডাক্তার কালীপদ পালিত এম.বি.বি.এস., তাঁর চিকিৎসাধীন আছি। ডাক্তার-বাবু বলেছেন, আমার রোগ হচ্ছে লো-ব্লাড পেশার, রক্তহীনতা, বাতব্যাধি ইত্যাদি। মুখে যা এসেছিল, এখন একটু কমেছে। একটু ভাল লাগতেছে।

ব্লাড পেশার লো হওয়াতে একেবারে দাঁড়াতে পারি না, এমন কি পায়খানা প্রশ্রাব করতে হলে দুইজনে ধরাধরি করে নিতে হয়। কোন রকমে দাঁড়াতে পারি না। ডাক্তারবাবু বলেছেন ভাল হয়ে যাব। অতিরিক্ত বার্ধক্যের দরুণ ভাল হতে সময় লাগবে। এই যাবৎ ২৬০ টাকার মত খরচ হয়ে গেছে। আরও কত টাকা ঔষধ খরচ লাগবে কি জানি। ঘূর্ণিবাত্যার ও বন্যার ফলে ছেলেদের রোজগার ও আর্থিক অবস্থা নিতান্ত খারাপ হয়ে গেছে। যাহা রোজগার হয় তাতে খাওয়া খরচ চলে না। রোগশয্যায় বসে তাই ভাবতেছি, উপায় কি হবে ?

আশা করেছিলাম ১লা জুলাই বাফার সম্মেলনে যোগদান করব। প্রস্তুত হয়ে স্টেশনে গিয়েছিলাম। হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে হার্ট ফেল ছিলো। তখন হতে রোগের আক্রমণ। আগে থাকলেও তাহা প্রকাশ হয়ে ছিলো না। কে আমাকে বাড়ী নিয়ে আসল, তাও আমার জানা ছিলো না। সর্ব আশা নিঃস্ফল হয়ে গেল। মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো। আপনাদের প্রেরিত ১০০ টাকায় আমি যে কত উপকৃত হয়েছি তাহা বলবার নয়। তাই ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কলম ধরতে হাত কাঁপতেছে। যদি ভাল হয়ে যাই, আপনার সাথে দেখা করবার জন্য ঢাকা যাব। আপনি আমার দরদী বন্ধু, তাই সমস্ত খবর জানালাম।

ইতি
আপনাদেরই
কবিয়াল রমেশ চন্দ্র শীল

পত্র : এগার

গোমদণ্ডী
৬-৪-৬৪

নুরুল হুদা সাহেব,

আমার আদাব নিবেন, এবং আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন।

আশা করি ভাল আছেন। আমি এখনও রোগমুক্তি লাভ করতে পারি নি। বার্ধক্য জীবনে রোগ কবলে পড়ে আছি। আপনাদের সক্রিয় সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

চট্টগ্রামের শিল্পীরা আমার সম্বর্ধনার আয়োজন করেছেন। তাই আপনাকে আগামী ১০ই এপ্রিল এই মহোৎসবে যোগদান করে সাফল্যমণ্ডিত করবেন।

প্রীতি রইলো—

ইতি
রমেশ চন্দ্র শীল

গ. কাজী মোতাহার হোসেনকে লেখা

পত্র : বার

গোমদণ্ডী
২২-২-৬২

কাজী মোতাহের হোসেন
প্রীতিভাজনেষু,

আমার নমস্কার ও গভীর শ্রদ্ধা নেবেন।

গত ২২-১০-৬১ তারিখ বাংলা একাডেমীতে আমার আর্থিক দুরবস্থায় সাহায্যের জন্য আবেদন করেছিলাম। সে পত্রের জবাবে আমাকে কর্মাধ্যক্ষ আহমদ হোসেন সাহেব জানিয়েছেন, বাংলা একাডেমীর ২৭তম কাউন্সিল সভায় আমাকে ২৫০/০০ টাকা আর্থিক সাহায্য দানের সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। চিঠি পেয়ে মনে লোকসঙ্গীতের নূতন জোয়ারের ঢেউ খেলতে লাগল।

আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনার অকৃত্রিম সহানুভূতি ও সক্রিয় সাহায্য জীবনে কখনও ভুলবার নয়। এই জন্য আপনার কাছে আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। বর্তমান আর্থিক দুর্দিনে বৃদ্ধ বয়সে সহসা টাকাগুলি পেলে বিশেষ সাহায্য হত। টাকাগুলো পাওয়ার ব্যবস্থা করলে বিশেষ বাধিত ও উপকৃত হব। আপনার মত দরদী ও হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির কাছে আমার দুরবস্থার কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

আশা করি ভাল আছেন।

ইতি

আপনার গুণমুগ্ধ
কবি রমেশ চন্দ্র শীল

ঘ. ডা. আবদুর রশীদকে লেখা

পত্র : তের

গোমদণ্ডী
১১-১০-৬৩ ইং

শ্রদ্ধেয় ডাক্তার আবদুর রশীদ সাহেব,

আমার আদাব নিবেন।

আপনাদের প্রেরিত ২০১৲ (দুইশত এক টাকা) পেয়েছি। পত্রিকার মারফত সবসময় আপনারা যে আমার চিকিৎসার জন্য সাহায্য কমিটি করেছেন, তাহা পড়ে মনে একটা বাঁচিয়া উঠবার আনন্দ জেগে উঠত। আজ সেই সাহায্য পেয়ে আপনাদিগকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনাদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ।

এই বৃদ্ধ বয়সে রোগাক্রান্ত অবস্থায় আমাকে বাঁচাইয়া রাখবার আগ্রহ আপনাদের মনে জেগেছে—'দেশদরদী কবিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে'। আপনাদের মত দরদী বন্ধুবান্ধব থেকে সাহায্য পেয়েছি। সবাই আমার রোগমুক্তি কামনা করিতেছেন। আশা করি, আপনাদের কামনা ও সাহায্য সফল হয়ে উঠবে। এখন আমি দুইজন ডাক্তারের চিকিৎসাধীন আছি। আমার রোগ হচ্ছে লো ব্লাড প্রেসার, বাত ব্যাধি, রক্তহীনতা এবং ভিটামিনের অভাব ইত্যাদি।

এখন আগের থেকে কিছুটা ভাল হয়েছি, কিন্তু এখনও পর্যন্ত মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি না। এই যাবৎ ৮০০ টাকার উপর খরচ হয়ে গেছে, আর কত যায় তাহা বলা যায় না। ডাক্তারেরা বলতেছেন, ভাল হতে সময় লাগবে।

রোগ শয্যায় বসে আপনাদের কথা ভাবতেছি। আর দেশের জন্য লিখতেছি। আপনাদের সাহায্য এই রোগাবস্থায় ও অভাবের দিনে আগুনে জল পড়ার মত হয়েছে। একদিকে আমার অসুখ, তার উপর বহে গেল প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘূর্ণিবাত্যা ও বন্যা। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে আমার দুইটা ঘর পড়ে গেছে, আর কত যে ক্ষতি হয়েছে তাহা বলবার নয়। আপনাদের মত দরদী বন্ধুবান্ধবের সাহায্যে আমার হতাশ প্রাণে আশার বান এসেছে।.....

৬. শেখ মুজিবর রহমানকে লেখা

পত্র : চৌদ্দ

P.O. & vill :
Gomdandi
9.1.64

জনাব
মুজিবর রহমান সাহেব,
আমার আদাব নিবেন।

রোগশয্যায় বসে আজ আপনার কথা স্মরণ করতেছি, আজ ৬ মাস যাবৎ এক দুরারোগ্য রোগে ভুগতেছি। বোধ হয় পত্রিকার মারফৎ জানতে পেরেছেন। সারা জীবন সংস্কৃতি সাধনার ভেতর দিয়ে দেশের সেবা করে আসতেছি। হঠাৎ রোগে আক্রমণ, তদুপরি বার্ধক্যের জরা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ-ঘূর্ণিবাত্যা-বন্যা ইত্যাদির কবলে পড়ে আর বাঁচবার আশা করতে পারতেছি না। অভাব অনটনে পড়ে রীতিমত রোগের চিকিৎসাও চলতেছে না। বয়স ৮৬ বৎসর। একেবারে অচল অবস্থায় আছি। দেশের দুঃখ দুর্দশা বসে ভাবি আর লেখি। আপনাদের অনুপ্রেরণা পেয়ে দেশের জনসাধারণ আবার জেগে উঠেছে।

এতদিন যাবৎ দেশের লোকের সাহায্য পেয়ে বহু টাকা রোগ আরোগ্যের জন্য খরচ করেছি। এখন কোনখান থেকে আর সাহায্য আসতেছে না! এখন নিরুপায় হয়ে রোগশয্যায় বসে আছি। তাই আজ আপনার নিকট লিখতেছি। শুনতে পেলাম আপনি অল্পকয়েক দিনের মধ্যে চট্টগ্রাম আসবেন। যদি পারি আপনার সাথে দেখা করতে চেষ্টা করব। মৌলানা ভাসানী সাহেবকে আমার সালাম দিবেন এবং আমার দুরবস্থার কথা বলবেন।

অভিনন্দন রইলো—

ইতি
আপনাদের দেশদরদী কবি
কবিয়াল রমেশ চন্দ্র শীল

সোহরাওয়ার্দী সাহেবের মৃত্যুতে.....

চ. সুনীল চক্রবর্তীকে লেখা

পত্র : পনের

গোমদন্ডী
১৪-১১-৬৪

প্রিয় সুনীল বাবু,

আজ সুপ্রভাতে আপনার হাতের চিঠি ও আপনার খবর পেয়ে মন যেন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। গোপালবাবুর নাম যে শুনালেম, মনে ভাবি তিনি নিরুদ্দেশ আছেন নতুবা তিনটি পয়সা খরচ করলে খবর পাই, তা হতেও বঞ্চিত হলাম কেন? আমার অবস্থা শুনুন, এখন ঘরেই বসে আছি, হাঁটতে মাথা ঘোরে। এপ্রিল দশ তাং সংবর্ধনায় টাউনে গিয়াছি বছরে একবার, লিখতে হাত কাঁপে। গোপাল বাবু যাওয়ার পর অর্চনার সঙ্গে একবার দেখা ওর ভাইয়ের বিয়েয়। যাক গোপালবাবুর ঠিকানাটি দেবেন, আর পুলিন সেন, বঙ্কিম সেন, শুভাশীষ চৌধুরীর।

এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'আমার বাংলা'য়, খোন্দকার ইলিয়াসের 'ভাসানী যখন ইউরোপে' বইটিতে আমার সংক্ষিপ্ত জীবনী আছে। আমিও পাঠাব, একটু দেরী বলে এই চিঠিখানা লিখছি। আমার অনেক ছড়া সমাজ বিষয় আছে, তার কতেক গোপালবাবুর হাতে ছিল, ঐগুলা খাতায় তুলতে দেরী হবে।

আমার মার নাম রাজকুমারী, বাবার নাম চণ্ডীচরণ শীল, পো.-গ্রাম গোমদণ্ডী, চট্টগ্রাম। আমার জীবন কবিতায়,

সাত বছর বয়সে, শিক্ষার মানসে, ইস্কুলে পাঠাল মোরে।
একাদশ বৎসর পূর্ণ না হইতে বাবা গেল স্বর্গপুরে॥
আমিই বালক, চালক পালক, আমার আর কেহ নাই।
মায়ের অলঙ্কার সম্বল আমার, বিক্রি করিয়া খাই।
তিন সহোদরা, মাতা, মাতামহী, ছয়জনে এক পরিবার।
এই হল শিক্ষা আমার, প্রাইমেরী পরীক্ষা ভাগ্যে
না জুটিল আর॥

পূর্ণেন্দু দস্তিদার রচিত কবিয়াল রমেশ শীল নামক বইটিতেও জীবনী আছে। আমার বয়স ৮৭। প্রথম কবিগান শুনেই চমক লেগে গান শিখিবার নেশা হল। সদরঘাট জেলেপাড়ায় প্রতি বৎসর জগদ্ধাত্রি পূজোয় কবিগান হয়। প্রথম গিয়ে দেখি কবি দুইজন, মোহনবাসী ও চিন্তাহরণ। জাতিতে দুইজন জলদাস, তাদের পোশাক কথার হাব-ভাব দেখে শিক্ষিত বলে মনে হল না। কি করে পদ পূরণ করে ভেবে মাথা ঘুরে গেল। কোন বি-এ এম-এ হলেও এমন অনর্গল পদপূরণ করা সম্ভব নয়। এই কবি শিখতে হবে এই পেয়ে বসল। তখন রাত নাই দিন নাই কথা গাথা যেথা সেথা এথা করে হাঁটতে বসতে পদ মিলনে চেষ্টা করি।

কতদিন পরে চট্টগ্রাম শহরের একটা কবিতা বানাই। পর বছর ঐ সদরঘাট জগদ্ধাত্রি পূজায় ঐ দুইজনের গান শুনতে গেলাম। চিন্তাহরণের গলা ধরে গেল। সভার লোকে হৈ চৈ আরম্ভ করে দিল। কয়জন মুসলিম ছেলে আমাকে জোর করে আসরে তুলে দিল। মোহনবাসী এত যে গালাগালি দিল, রাগে অস্থির হয়ে তারপর আসরে আমিও গালাগালি দিতে আরম্ভ করলাম। দেখি পদ মিলে যাচ্ছে.... ইত্যাদি।

আজ এ পর্যন্ত। আপনার চিঠিমত সব পূরণ করে কারো দ্বারা পাঠাব। কিন্তু অনেকে লোকসংগীত ছড়া ছাপা নাই, মাইজভাণ্ডারী গান বিচ্ছেদ গান ছাপা আছে। পূর্ণেন্দুবাবুর কাছে লিখলেও চিঠি দ্বারা জানবেন। আমার লিখা আপনার পড়তে কষ্ট হবে।

রমেশ শীল

পত্র : ষোল

তা. বি.

১২৮৪ বাংলার ২৬ বৈশাখ শুক্রবার জন্ম।

বাবা গান বাজনায় আমার ঝোঁক দেখে প্রাইমেরী ইস্কুলে পড়া-কালীন বৃহৎ তরজার লড়াই নামক বই কিনে দেন। পাড়ায় রমেশ

শীল ও শ্যামাচরণ নামক আরও দুইজন আমার সমবয়স্ক ছেলে ছিল। সন্ধ্যার পর পাড়ার লোকেরা আমাদের দুইজনকে দিয়ে তরজা মুখস্থ করা গান শুনত। শাক্ত ভক্ত নারী পুরুষ রাধাকৃষ্ণ গানের বিষয়বস্তু ছিল।

একাদশ বৎসর বয়সে বাবা মারা গেল। মাষ্টারেরা এসে পড়ার খরচ দেবে বলল। বই গায়ের জামা ইত্যাদি মাহিনাত নাই। মা তিন বোন বৃদ্ধা মাতামহী এই ছয়জনেরও জীবিকার উপায় নাই। এখানে পড়া বন্ধ হল।

মাতামহ কৃষক ও ক্ষৌরকর্ম করতেন। পিতা পিতামহ ক্ষত চিকিৎসা ঘায়ের লতাপাতা দিয়া আর বাত ফোরা ওপারেসান। উভয় কুলে আর্থিক কষ্ট ছিল। কোন রকমে খাওয়া পড়া চলত। ছোটবেলা হতে গান বাজনা ও ধর্মীয় ভাবধারায় পাগল ছিলাম। বিয়ে ২৩ বছর বয়সে। সমবয়স্ক হিন্দু মুসলিম ছেলেদের নিজ গ্রামের ভিন্ন গ্রামের খুব হৃদ্যতা ছিল।

চট্টগ্রাম সম্বন্ধে কবিতা লিখার পর সঙ্গীরা মনে করত আমি কবিয়াল। সদরঘাটে মোহনবাসীর সঙ্গে প্রথম গান। সভার লোকে ৫ টাকা পুরস্কার দিল। আর লোকেও আমি ভাল সরকার হব বলল। মনে উৎসাহ এল গান শিখবার। তখন দেশ ধন ধানে ভরপুর। আমি টাকায় দুই আড়ি চাউল কিনেছি। আমার ১০/১১ বয়সে বাজারে কড়ির প্রচলন ছিল। গাজীগান সারিগান পটিগান রামায়ণগান কবি-গান যাত্রা নাটক বেশী ছিল। দোলের সময় হলিগান, বিহুর সময় ঢাকীদের শিবের গাজন, দুর্গাপূজায় সাতদিন জাগরণ পালা, মানুষ মারা গেলে ক্রিয়ার সময় বিষ্ণুপদি গান, নৌকা বাইচ গান হত।

মাইজভাণ্ডার আমাদের গ্রামের সারদাবাবু প্রথম গিয়া আমাকে বার বার বলে, মহাপুরুষ দেখবে চল মাইজভাণ্ডারে যাই। অনেকবার বিরক্ত করে যাতায়াত খরচ সে দিয়া আমায় নিয়া যায়। দেখলাম গদি পরে উলংগ অতি উজলবরণ এক পুরুষ নির্বাক। সিদ্ধ বলে মেনে নিলাম। সেইখানে গানগুলির ভাষা নাই দেখে গান তৈরী করলাম। আমার কদর সেইখানে বেড়ে গেল। ৮ খানা বই করেছি, এখনও খুব চলে।

কবিগান ১৯৩৬-৩৭ সনে কম হতে আরম্ভ হল। সমস্ত কবিকে আমার বাড়ী এনে রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর জিজ্ঞাসা করি, গান কেমন পান? কেহ কয় মোটে নাই, কেহ ২/১ খান পাই। তার কারণ কি জিজ্ঞাসা করলাম, সিনামা তপ কীর্তনে গান হয় না। আমি বলি এক-দিন রেংগুন হতে চিঠি এলে ৪/৭ বাড়ী তালাশ করতাম পড়িবার জন্য। এখন টেলিগ্রাম মেয়েরা পড়ে। কুরুচিপূর্ণ গান ছেড়ে দাও। কবিরা কয় সমিতি কর। রমেশ উদ্বোধন কবি সমিতি গঠন হল। দুই বছর গত হতে দুর্ভিক্ষ এল। ভাল ভাল দোহার কবিও ৪/৫ জন মরে গেল। ৪৪ সন বাগোয়ানে কৃষক সম্মেলনে জেলা কবি সমিতি গঠন হল। সুধী প্রধান, শুভাষ মুখোপাধ্যায় চট্টগ্রামে আমার গান শুনে কলিকাতায় আমায় গান করতে আনে সংস্কৃতি সম্মেলনে। সঙ্গে ফণী বড়ুয়া রাই গোপাল সহ। গোমানী ও লম্বদর চক্রবর্তী বিপক্ষে। দাদা ও নাতীর দারা ছিল সেই গানে। আমাদের জয় বলে লোকে ঘোষণা করল।

একবার আপনার সঙ্গে মুখামুখি হলে বহু বলবার ছিল। আবার লিখব। অসম্পূর্ণ অনেক রহিল। প্রতি কথার ছড়া, যুদ্ধের গান ছাপা হয় নাই। এমন বিস্তর আছে। পর চিঠিতে জানাব।

রমেশ শীল

পত্র ঃ সতের তা. বি.

(আপনার অসম্পূর্ণ প্রশ্নগুলির জবাব লিখতে ভোটের গোলযোগে লিখতে বিলম্ব হল। কোন গান মনে নাই)

সব চেয়ে গানে আনন্দ পেয়েছি নেত্রকোণা সারা ভারত কৃষক সম্মেলনে আর ৫৪ সনে ঢাকা সাহিত্য সম্মেলনে।

আমার শিষ্যদের মধ্যে ফণী বড়ুয়া আর নিরঞ্জন দাস। দেশে কৃষক মজদুর রাজনীতি বুঝলে সমাজতন্ত্র আসবে বলে আমার ধারণা। তাদের একতা হলে দেশের উন্নতি।

আমার জীবনের অগ্রগতির কন্টক দৈন্যতা আর অশিক্ষা। আমার বিবাহিত জীবনে কবিগানের প্রেরণা জুগিয়েছে। প্রেমের গান ও বিরহ গান সে হতে আরম্ভ।

আমার প্রথম জীবনের সাথীগণ আমার গানে উন্নতির জন্য খুব উৎসাহ দিতেন। ২০/২৫ টাকায় গান নিলে দলের ভাগ তারা নিতেন না। সেই টাকা দিয়া ভারত রামায়ণ কাসাসুল আম্বিয়া গীতা মহানবী বাংলা কোরান ইত্যাদি বইগুলি কিনতাম। গত চিঠিতে লিখেছি 'কবিয়াল রমেশ শীল' নামক বইখানা নিলে আপনার সাহায্য হবে। কলিকাতা বঙ্কিম সেনের কাছে পাবেন, আমার বিশ্বাস। নতুবা পূর্ণেন্দুবাবুর কাছে লিখলে পাঠাবে। আমার অনেক ছড়া গান ছাপা হয় নাই। টাকার অভাবে ছাপান গেল না। বার আউলিয়ার কবিতাটি পরে পাঠাব। এখন পাওয়া গেল না·····আর কোন কথা থাকলে জানাবেন।

আপনাদেরই
রমেশ শীল

নানাদিগের টানে মন থাকতেও মন হারা আমার, সংবর্ধনায় সেই শোকগীতিটা হয়েছে। তাতে ছাপা হবে বলে আশা করেছিলাম। ব্যয় ভারের জন্য অনেক ভাল গান ও ভাল ভাল ছড়া রয়ে গেল, কি জানি আমার জীবদ্দশায় হয়ে ওঠে কিনা। বিধবা বিবাহ, নারী নির্যাতন, সমাজ রহস্য, সমাজ কোন পথে, অনাস্থার ধর্মশিক্ষা সংকট ইত্যাদি ছড়া আছে। গানের ত ইয়ত্তা নাই। গোপাল বাবুকে বলবেন একখান চিঠি যেন দেন।

পরিশিষ্ট

আবেদন

পল্লীপ্রাণ সেবী ভাইগণ,

একদা জারী, মুর্শিদী. বাউল, কীর্তন, গাজীগান, যাত্রা প্রভৃতি গান অবিভক্ত বাংলার গ্রামীণ জীবনে প্রাণের সাড়া জাগাতো। বিবাহ ও

পূজা পার্বণে এসব গানের সাথে পল্লীর সরস প্রাণের সাড়া জাগাতো পল্লীর অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত কবিদের গাওয়া কবিগান। কিন্তু ধর্মীয় বিষয়বস্তু নিয়ে ছিল এদের সীমিত গণ্ডী। তবুও ধর্মীয় ভিত্তিতে গাওয়া এসব কবিগান মানুষ ও প্রকৃতির সাথে এক নিগূঢ় সখ্যতা স্থাপন করে যেতো। ভারত বিভক্তির ফলে বহু কবি-সম্প্রদায় পশ্চিম বঙ্গে চলে যাওয়াতে পূর্ব বঙ্গের কবিগান আজ প্রায় অবলুপ্তির পথে। এমন কি পূর্ব বঙ্গের কোন কোন জেলায় কবিগান কি ও কেন, তাহা জনসাধারণের কল্পনারও বাইরে। অবশ্য অন্যান্য জেলার অন্যতম চট্টগ্রামে এর প্রচলন সমধিক পরিলক্ষিত হয়।

সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে জনমনে রুচিরও পরিবর্তন হয়েছে অনেক বেশী। কবিগানও আজ তার শৈশবের জড়তা কাটিয়ে যৌবনের প্রাণ-চাঞ্চল্যে ভরপুর। তাই শুধু মাত্র ধর্মীয় বিষয়বস্তুর উপর আজ আর কবিগানের গণ্ডী সীমিত নয়। ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে জনশিক্ষা গঠনমূলক ভাবধারা নিয়ে আজ কবিগান এগিয়ে চলছে দুর্বার গতিতে। ধন-বিদ্যা, একাল-সেকাল, নারী-পুরুষ, কৃষক-মজুতদার, বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ, এ সমস্ত বিষয়বস্তু আজ কবিগানের সাবলীল ছন্দ ও সুরমাধুর্যে জনমনকে আন্দোলিত করেছে।

আজ সুদীর্ঘ ৪০ বৎসর ধরে কবিগানের সেই মহান সাধনার ব্রত নিয়ে আমি পূর্ব বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় প্রদর্শনী ও লোকসঙ্গীত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে জনমনে পল্লীর প্রাণসম্পদ কবিগানের স্মৃতিখানি বাঁচিয়ে রেখেছি। এখন বৃদ্ধ বয়সে রোগ শয্যায় আমি গান গাওয়ার শক্তি হারিয়ে ফেলেছি। তাই 'রমেশ শীল সম্প্রদায়' নামে আমার সুযোগ্য শিষ্য কবিয়াল শ্রী ফণীন্দ্র লাল বড়ুয়া ও পুত্র শ্রীমান যজ্ঞেশ্বর শীল উভয়ে পাল্টা দিয়ে গান পরিবেশন করে থাকে।

আশা করি সুধীবৃন্দ, বিভিন্ন জেলায় পল্লীগীতি ও কবিগানের আসর দিয়ে অবলুপ্তির পথ হতে কবিগানকে রক্ষা করে পল্লী-প্রকৃতির প্রাণ প্রতিষ্ঠায় চেষ্টা করবেন।

ইতি

কবিয়াল রমেশ চন্দ্র শীল

পত্রের প্রাসঙ্গিক পরিচয়[৯]

পত্র : এক

সন্তান : এই পত্রে সন্তান বলতে রমেশ শীল তাঁর পুত্র সন্তানদের কথাই বিবেচনা করেছেন। রমেশ শীলের পুত্রসন্তান চার জন। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রী বিশ্বেশ্বর শীল ; দ্বিতীয় পুত্র শ্রী যজ্ঞেশ্বর শীল ; তৃতীয় পুত্র শ্রী বনমালী শীল এবং কনিষ্ঠ পুত্র শ্রী পুলিন শীল। এছাড়াও রমেশ শীল দুজন কন্যা সন্তানের জনক।

সমাজে শত্রু : তৎকালীন রক্ষণশীল গ্রামীণ সমাজে রমেশ শীলের উদার মানবতাবাদী বিশ্বাস ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ স্বভাবতঃই সমাজপতিদের নিকট গ্রহণযোগ্য হয় নি। ধর্মের ক্ষেত্রে তাঁর সর্বধর্মসমন্বয়বাদী ও লোকবাদী আচরণ সামগ্রিক ভাবে হিন্দু সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। মাইজ-ভাণ্ডারের পীরের দরবারে কবিয়াল নিয়মিত যাতায়াত শুরু করলে তাঁর বিরুদ্ধে গো-মাংস আহারের অভিযোগ তুলে তাঁকে সমাজচ্যুত করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর গভীর ও আন্তরিক সম্পর্ক থাকার কারণে রমেশ শীলকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার এ-প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত সফল হয় নি।

গুরুদেব : ধর্মাচারের জগতে রমেশ শীল গুরুবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। দীর্ঘ জীবনকালে তিনি বহু মুসলমান পীর ও হিন্দু সাধুর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে মাদারবাড়ীর নসু মালুম, মাইজভাণ্ডারের গোলাম রহমান, নন্দনকানন-এর বালক সাধু প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে রমেশ শীল নিজে হাওলার সাধক পুরুষ জগদানন্দ পুরীকে তাঁর 'গুরুদেব' রূপে বিবেচনা করতেন। এই সাধক পুরুষ হাওলার কধুরখীল স্কুলের নিকটবর্তী স্থানে তাঁর আশ্রম স্থাপন করেছিলেন। শেষ বয়সে তিনি পুরীতে প্রাণ ত্যাগ করেন। বর্তমানে 'হরিবাবুর আশ্রম' নামে

পরিচিত জগদানন্দের আশ্রমটি রমেশ শীলের বাড়ী থেকে এক মাইলেরও কম দূরবর্তী। কবিয়াল এখানে প্রায় নিয়মিতই ধর্মালোচনায় অংশ নিতেন।

তোমাদের মা : রমেশ শীলের দ্বিতীয়া স্ত্রী অবলা বালা। কবিয়ালের চারজন পুত্রসন্তানই তাঁর গর্ভজাত। তিনি আজীবন রমেশ শীলের সাধনসঙ্গিনী ছিলেন। মাত্র তিন বছর আগে তিনি মারা যান।

পত্র : দুই

রামকৃষ্ণ : ১৮৩৬ সালে তিনি হুগলীর কামারপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাল্য নাম গদাধর। বিশ বছর বয়সে তিনি রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীর পুরোহিত নিযুক্ত হন। ক্রমান্বয়ে তিনি সর্বধর্মসমন্বয়বাদী মতের প্রচার শুরু করেন এবং 'পরমহংসদেব' উপাধি ধারণ করেন। তাঁর মূলমন্ত্র ছিল, 'সর্ব ধর্মই সত্য, যত মত তত পথ'। তাঁর শক্তি উপাসনা ক্রমে ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রেরণামন্ত্রে পরিণত হয়। রম্যাঁ রলাঁ কর্তৃক জীবনী রচিত হলে ইউরোপবাসীদের মধ্যেও তিনি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। ১৮৮৬ সালে রামকৃষ্ণ মৃত্যুবরণ করেন। বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী প্রতিষ্ঠিত 'রামকৃষ্ণ মিশন' তাঁরই স্মৃতিবাহী।

মনোমোহন : সাধক মনোমোহন দত্ত। ১২৮৪ সনে ত্রিপুড়ার সাতমোড়ায় জন্ম। ছাত্রবৃত্তি লাভের পর তাঁর আনুষ্ঠানিক লেখাপড়ার ইতি ঘটে। ১৩০৩ সনে তিনি সর্বধর্মসমন্বয়বাদী সাধক আনন্দস্বামীর দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং সাধনা শুরু করেন। শেষ জীবনে তিনি বিষপানে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১৩১৬ সনে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর রচিত মরমী সঙ্গীতের সংখ্যা সহস্রাধিক।

রামপ্রসাদ : সাধক রামপ্রসাদ সেন। ১৭২০ সালে চব্বিশ পরগনার হালিশহরে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা, সংস্কৃত, ফারসী ও হিন্দী ভাষায় তাঁর পারদর্শিতা ছিল। যৌবনে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। পরিণত বয়সে তিনি 'কবিরঞ্জন'

উপাধি পান। মরমী সঙ্গীতে তাঁর বিশিষ্ট অবদান রাম-প্রসাদী সুরের প্রবর্তন। ১৭৮১ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

বিবেকানন্দ : শৈশবে বীরেশ্বর ও যৌবনে নরেন্দ্রনাথ দত্ত নামে পরিচিত স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৬৩ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। কলেজে পড়ার সময় তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের সভ্য হন এবং পরে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৮৮৬ সালে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ও বরাহনগরে মঠ স্থাপন করেন। পরিব্রাজকরূপে সমগ্র ভারতে এবং আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে রামকৃষ্ণের ধর্মমত প্রচার করেন। এ-সকল স্থানে তিনি বেদান্ত-শিক্ষারও প্রবর্তন করেন। ১৮৯৭ সালে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা করেন যা দ্রুত সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামেও বিবেকানন্দের অবদান অসামান্য। 'পরিব্রাজক', 'ভাববার কথা', 'বর্তমান ভারত', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'Karmayoga', 'Rajayoga', 'Jnanayoga', 'Bakhtiyoga' প্রভৃতি তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ। ১৯০২ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

বই বিক্রীর : রমেশ শীল-প্রকাশিত বই বিক্রীর হিসাব খাতার শেষ পৃষ্ঠা।

গংগা ভাসা : গঙ্গা নদীর জলে ভাসা। তবে প্রচলিত রীতিতে যে-কোন নদীজলে মরদেহ ভাসানোই গঙ্গা ভাসা বলে পরিচিত।

গংগাগির : চট্টগ্রামের একজন প্রথিতযশা সাধক পুরুষ। দেওয়ানজী পুকুর পাড়ের দত্তত্রেয়ী আখাড়ায় তাঁর সমাধি রয়েছে। জীবিতকালে রমেশ শীলের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল।

বালক সাধু : বেদান্তবাদী সাধক। চট্টগ্রাম শহরের রথের পুকুর পাড়ে তাঁর সমাধি রয়েছে। তাঁর সঙ্গেও রমেশ শীলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

জ্যোতিষানন্দ : চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডস্থ শংকর মঠের প্রয়াত গুরু।

পত্র : তিন

নুরুল হুদা : ভারত বিভাগকালীন যুগে শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও ফজলুল হকের রাজনৈতিক সহযোগী ছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তৎকালীন পূর্ববঙ্গে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। বুলবুল ললিত-কলা একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক হিসেবে এদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। সত্তর-উর্ধ্ব মাহমুদ নুরুল হুদা বর্তমানে বুলবুল ললিতকলা একাডেমীর সভাপতি।

বুলবুল একাডেমী : ভারতীয় উপমহাদেশ-খ্যাত নৃত্যশিল্পী বুলবুল চৌধুরীর স্মরণে ১৯৫৫ সালে গঠিত বুলবুল স্মৃতি কনভেনশন ও বুলবুল স্মৃতি কমিটির উদ্যোগে ১৯৫৫ সালে বুলবুল ললিতকলা একাডেমীর প্রতিষ্ঠা হয়। তৎকালীন পাকিস্তানে নৃত্য ও সঙ্গীত-চর্চায় বুলবুল একাডেমীর স্থান ছিল অতুলনীয়। সংক্ষেপে 'বাফা' নামে পরিচিত এই প্রতিষ্ঠান এখনও ঢাকায় সঙ্গীত, নৃত্য ও যন্ত্রসংঙ্গীত প্রশিক্ষণে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

লোকসঙ্গীত ও শিল্প-উৎসব : ১৯৬১-৬২ সালের ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে বুলবুল একাডেমী ঢাকায় একটি 'লোকসঙ্গীত ও শিল্প উৎসব'-এর আয়োজন করে। পল্লীগীতি, কবিগান, জারী, যাত্রা, বাউল, গম্ভীরা, সাঁওতাল, মণিপুরী ও গারো নৃত্য, পুতুল নাচ, চারুকলা প্রদর্শনী প্রভৃতি এই উৎসবের অংশ ছিল। রমেশ শীলের কবিগান এই উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ ছিল।

যজ্ঞেশ্বর : রমেশ শীলের দ্বিতীয় পুত্র যজ্ঞেশ্বর শীল।

পত্র : চার

আর্ট কাউন্সিলের সম্পাদক : তৎকালীন আর্ট কাউন্সিলের সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন (১৯২৭-১৯৮৬)। পরবর্তী জীবনে

তিনি বিচারপতি-রূপে খ্যাতি অর্জন করেন। পঞ্চাশের দশকে গণতন্ত্রী দল ও বুলবুল একাডেমীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি প্রায় দশ বছর সুপ্রীম কোর্টের বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর বহু রায় পরবর্তী সময়ে আইনের জগতে উচ্চ মর্যাদা পায়। তিনি বহু খ্যাতনামা আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। গণতন্ত্রের সপক্ষে তাঁর ভূমিকা সাম্প্রতিক-কালে বাংলাদেশে উচ্চ-প্রশংসিত হয়েছে।

পত্র : পাঁচ

বাফার সপ্তম : প্রতিষ্ঠা দিবস　১৯৫৫ সালের ১লা জুলাই বুলবুল একাডেমীর প্রশিক্ষণের প্রথম ক্লাশ শুরু হয়। পরের বছর থেকে এই দিনটিকে বাফার প্রতিষ্ঠা দিবস রূপে পালন করা হয়। ১৯৬২ সাল ছিল বাফার সপ্তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। এ-উপলক্ষে ওস্তাদ আয়েত আলী খানের সভাপতিত্বে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত এক সভায় রমেশ শীলকে সংবর্ধনা দেয়া হয়।

পত্র : সাত

খালেক, তুলসী, দেলোয়ার : বাফার তৎকালীন পিয়ন আবদুল খালেক ও তুলসী এবং তৎকালীন কেয়ার-টেকার দেলোয়ার হোসেন।

ডি. পি. আই. : তখন পূর্ব পাকিস্তান জনশিক্ষা বিভাগের পরিচালক বা ডি. পি. আই. ছিলেন অধ্যাপক শামস-উল-হক। পরবর্তী সময়ে তিনি পাকিস্তানের শিক্ষা মন্ত্রী এবং বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

ভাতা পুনর্বহাল : ১৯৫৯ সালে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা বিভাগ নিম্নোক্ত পত্রের মাধ্যমে রমেশ শীলকে একটি ভাতা মঞ্জুর করেন :

....in recognition of the meritories literary activities of Babu Ramesh Chandra Siel (Sar-

ker) of Chittagong to the Bengali Literature, Government are pleased to sanction a literary pension to the amount of Rs. 40/- (forty) per month with effect from 1.1.59.

The charge will be met from the provision under the head "55. superannuation allowances and pensions for distinguished and maritorious services" in the Provincial Civil Budget Estimate.

কিন্তু রমেশ শীলের গণমুখী কার্যকলাপে রুষ্ট হয়ে সরকার ১৯৬২ সালের এপ্রিল মাসে নিম্নোক্ত পত্রের মাধ্যমে এই ভাতা বন্ধ করে দেন :

.....in accordance with rule 5 of the rules for the award of literary pensions and after due consideration of the conditions of the award, Government have been pleased to decide that Literary pension sanctioned... to Babu Ramesh Chandra Siel (Sarker) of Chittagong should be discontinued with effect from 1.1.62.

পরবর্তী সময়ে অনেক চেষ্টা করেও রমেশ শীলের এই ভাতা পুনর্বহাল করা যায় নি।

পত্র : নয়

গ্রীন এ্যারো : ষাটের দশকে ঢাকা-চট্টগ্রামের মধ্যে দুটি রেলগাড়ী নিয়মিত যাতায়াত করত ; রাতে মেইল ও দুপুরে গ্রীন এ্যারো। এই দশকের শেষ দিকে এই পথে সংযোজিত হয় প্রাতঃকালীন 'উল্কা'।

পত্র : দশ

কালীপদ পালিত : তৎকালীন চট্টগ্রাম শহরের একজন ডাক্তার।

হার্টফেল : সম্ভবতঃ হার্ট-এ্যাটাক লিখতে গিয়ে রমেশ শীল ভুলবশতঃ হার্টফেল লিখেছেন। এবার রোগাক্রান্ত হওয়ার পর কবিয়াল ব্লাড-প্রেশার ও হার্টের রোগ থেকে আর আরোগ্য লাভ করতে পারেননি।

পত্র : এগার

সংবর্ধনা : ১৯৬৪ সালের ১০ই এপ্রিল চট্টগ্রামের মুসলিম ইনস্টিটিউটে রমেশ শীলকে এক নাগরিক সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক আবুল ফজল। কবি জসীম উদ্‌দীন প্রমুখ সংবর্ধনা সভায় বক্তৃতা করেন।

পত্র : বারো

মোতাহার হোসেন : সাহিত্যিক-বিজ্ঞানী কাজী মোতাহার হোসেন। ১৮৯৭ সালে জন্ম। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন প্রভাষক রূপে। ১৯৫০ সালে পিএইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৫৪ সালে তিনি সংখ্যাতত্ত্বের প্রফেসর পদ লাভ করেন। ১৯৬৬ সালে পরিসংখ্যান ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হলে এর প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক নিযুক্ত হন। ১৯৭৫ সালে 'জাতীয় অধ্যাপক'-এর মর্যাদা লাভ করেন। ১৯৮১ সালে মৃত্যু-বরণ করেন। যৌবনে মুসলিম সাহিত্য সমাজ ও 'শিখা'-সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'সঞ্চরণ' (১৯৩৭), 'নজরুল কাব্য পরিচিতি' (১৯৫৫), 'সেই পথ লক্ষ্য করে' (১৯৫৮), 'সিম্পোজিয়াম' (১৯৬৫), 'গণিত শাস্ত্রের ইতিহাস' (১৯৭০) ও 'আলোক বিজ্ঞান' (১৯৭৪)।

বাংলা একাডেমীর সাহায্য : কবিয়াল রমেশ শীলের জন্য আর্থিক সাহায্য মঞ্জুর করে ১৯৬২ সালের মে মাসে বাংলা একাডেমী নিম্নোক্ত পত্র প্রেরণ করে :

....'আপনার ২২-১০-৬১ ইং তারিখের পত্রের জবাবে আনন্দের সঙ্গে আপনাকে জানাচ্ছি যে বাংলা একাডেমীর ৩৭তম কাউন্সিল সভায় আপনাকে ২৫০·০০ টাকা আর্থিক সাহায্য দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।'

আহমদ হোসেন : শিক্ষাবিদ। চট্টগ্রামে জন্ম ১৯১৭ সালে ; মৃত্যু ১৯৮৬ সালে। বাংলায় এম. এ. পাশ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সিভিল সাপ্লাইতে চাকুরী নেন। পরে সরকারী কলেজের প্রভাষক হন। ১৯৭৮ সালে নজরুল সরকারী কলেজের অধ্যক্ষরূপে অবসর নেন। শিক্ষকতা ছাড়াও তিনি বাংলা একাডেমীর সচিব, ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের সচিব এবং টেক্স্ট বুক বোর্ডের সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর রচিত 'উচ্চতর বাংলা রচনা'য় ষাটের দশকেই রমেশ শীলের জীবনী স্থান পায়।

পত্র : তের

আবদুর রশীদ : তৎকালীন চট্টগ্রামের একজন ডাক্তার ও সমাজকর্মী।

দেশদরদী কবিকে : ১৯৬৩ সালে রমেশ শীলের চিকিৎসার প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য চট্টগ্রামে সংগঠিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ-সময়ে 'দেশদরদী কবিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে' শীর্ষক প্রচারপত্র প্রকাশ করা হয় এবং পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জনসাধারণের নিকট সাহায্যের আবেদন জানানো হয়।

পত্র : চৌদ্দ

মুজিবর রহমান : স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান। ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ ফরিদপুরের গোপালগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রজীবনে কলকাতায় গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও পাকিস্তান-আন্দোলনে অংশ নেন। ভারতবিভাগের পর আওয়ামী মুসলিম লীগ ও পরে আওয়ামী লীগ গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫৪ ও ১৯৫৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান মন্ত্রীসভার সদস্য ছিলেন। গণতন্ত্র এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের ফলে পাকিস্তান সরকার তাকে বার বার কারারুদ্ধ করে। ষাটের দশকে ৬-দফা ঘোষণার মধ্য দিয়ে তিনি পূর্ব পাকিস্তান এবং আওয়ামী লীগের অবিসংবাদিত নেতারূপে আত্ম-প্রকাশ করেন। ১৯৬৬ সালে তিনি 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'য় অভিযুক্ত হয়ে বন্দী হন। ১৯৬৯ সালে অভূতপূর্ব গণ-আন্দোলনের মুখে সরকার তাঁকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের জাতীয় নির্বাচনে তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ১৯৭১ সালে মুজিবর

রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। যুদ্ধ চলাকালে তিনি পাকিস্তানে কারারুদ্ধ ছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে তিনি প্রথমে রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী ও পরে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট তিনি এক সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হন।

জনসাধা- : এতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ষাটের দশকের গণ আন্দো-
রণ জেগে লনের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়েছে।
উঠেছে···

ভাসানী : মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। ১৮৮০ সালে পাবনায় জন্ম। দেওবন্দে শিক্ষা লাভের পর বিশ শতকের প্রথম দিকে আসামে আন্দোলনে অংশ নেন। ১৯১৯ সালে খেলাফত আন্দোলনে অংশ নিয়ে কারারুদ্ধ হন। কারামুক্ত হয়ে বিপ্লবী গ্রুপ 'অনুশীলনে' যোগ দেন। ১৯২৪ সালে পুনরায় কারারুদ্ধ হন। ১৯৩৬ সালে আসাম অঞ্চলে মুসলিম লীগ দলকে সংগঠিত করেন। ১৯৪২ সালে 'ভাসানী' উপাধি লাভ করেন। ভারত-বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন এবং আওয়ামী মুসলিম লীগ, আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ গঠনে উদ্যোক্তার ভূমিকা নেন। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন ও ১৯৬৯ সালের গণ-আন্দোলনে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। পাকিস্তানী শাসনামলে বহুবার অন্তরীণ ছিলেন। এই সময়ে এদেশে বামপন্থী রাজনীতি তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। ১৯৭৬ সালে তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। রমেশ শীলের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পরিচয় খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস-প্রণীত 'ভাসানী যখন ইউরোপে' গ্রন্থে বিধৃত রয়েছে।

সোহরা- : হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। ১৮৯৩ সালে মেদিনীপুরে জন্ম।
ওয়ার্দী আইন শাস্ত্রে উচ্চতম ডিগ্রী লাভের পর রাজনীতিতে যোগ দেন। বিশের দশকে বঙ্গীয় বিধান সভার সদস্য ও কলকাতা মিউনিসি-প্যাল কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র ছিলেন। ১৯৩৭-৪৫ কালপর্বে বঙ্গীয় সরকারের মন্ত্রী এবং ১৯৪৬ সালে বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন। ভারত বিভাগকালে কলকাতায় দাঙ্গাবিরোধী

আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা নেন। ভারত বিভাগের পর প্রথম দিকে পাকিস্তানী শাসকচক্র কর্তৃক দেশদ্রোহী রূপে বিবেচিত হন। তবে এর মধ্যেই তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগ ও আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রধান নেতারূপে প্রতিষ্ঠিত হন। পরে ১৯৫৬-৫৭ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারীর পর অন্তরীণ ও কারারুদ্ধ হন। ১৯৬৩ সালে বৈরুতে মৃত্যুবরণ করেন। রমেশ শীল এই পত্রে সম্ভবতঃ সোহরাওয়ার্দ্দীর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশমূলক কোন বাক্য লিখতে চেয়েছিলেন।

পত্র : পনের

সুনীল বাবু : সুনীল চক্রবর্তী। চাঁটগা থেকে দেশবিভাগের পর কলকাতা চলে যান। প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব।

গোপাল বাবু : গোপাল বিশ্বাস। একসময় চট্টগ্রামের সদরঘাট নিবাসী ডাক্তার জগদা বিশ্বাসের পুত্র। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী রাজনীতি ও প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের একজন নেতা।

তিনটি পয়সা : তখন পোস্টকার্ডের মূল্য ছিল তিন পয়সা (চার পয়সায় ছিল এক আনা)।

সংবর্ধনা : ১৯৬৪ সালে প্রদত্ত চট্টগ্রামের নাগরিক সংবর্ধনা।

অর্চনা : অর্চনা বিশ্বাস। গোপাল বিশ্বাসের স্ত্রী। একসময় চট্টগ্রামবাসী ছিলেন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের প্রগতিশীল নারী আন্দোলনের একজন নেত্রী।

বঙ্কিম সেন : চট্টগ্রামের নোয়াপাড়ার গুজড়ায় পৈতৃক নিবাস। চট্টগ্রামের এককালের খ্যাতনামা কমিউনিস্ট নেতা। তিনি নিজেও গান রচনা করতেন। ১৯৩৮ সালে অন্তরীণ থেকে মুক্তি পাওয়ার পর রমেশ শীলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জন্মে। রমেশ শীলকে বামপন্থী চেতনায় উজ্জীবিত করতে এবং চট্টগ্রামের কবিয়ালদের সমিতি গঠনে তার অবদান গুরুত্বপূর্ণ। দেশবিভাগের পর কলকাতা চলে যান। সত্তরের দশকে মৃত্যুবরণ করেন।

শুভাশীষ চৌধুরী : প্রখ্যাত লোকগীতি-সংগ্রাহক আশুতোষ চৌধুরীর পুত্র। ষাটের দশকে কলকাতা চলে যান। এঁদের পৈতৃক নিবাস ছিল রমেশ শীলদের পার্শ্ববর্তী গ্রাম কধুরখীলে। এই পরিবারের সঙ্গে রমেশ শীলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় : কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় (জ. ১৯১৯)। আধুনিক বাংলা কবিতার ধারায় মার্কসবাদী কবি হিসেবে সুপরিচিত। কমিউনিস্ট সংগঠকরূপেও খ্যাতি রয়েছে। তাঁর 'আমার বাংলা' গ্রন্থে 'চাঁটগায়ের কবিওয়ালা' শীর্ষক রচনায় রমেশ শীলের জীবনী লিপিবদ্ধ রয়েছে।

খোন্দকার ইলিয়াস : সাহিত্যিক-সাংবাদিক খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস। ১৯২৪ সালে পাবনায় জন্ম। দীর্ঘদিন বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। পেশাগতভাবে সাংবাদিক। তাঁর রচিত 'ভাসানী যখন ইউরোপে' গ্রন্থে রমেশ শীলের জীবন-পরিচয়মূলক আলোচনা রয়েছে। 'কত ছবি কত গান' (১৯৬৮), 'মুজিব-বাদ' (১৯৭২) তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

পূর্ণেন্দু দস্তিদার : সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক নেতা পূর্ণেন্দু দাস্তিদার। ১৯০৯ সালে চট্টগ্রামের ঘলঘাটে জন্ম। পেশাগত জীবনে আইন ব্যবসা করতেন। চট্টগ্রামে বামপন্থী আন্দোলন সংগঠনে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের পক্ষে পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে তিনি শহীদ হন। তিনিই প্রথম 'কবিয়াল রমেশ শীল' নামে কবিয়ালের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থ রচনা করেন। বস্তুতপক্ষে রমেশ শীলের বামপন্থী আন্দোলনে অংশ-গ্রহণে তিনিই ছিলেন অন্যতম সূত্র। পূর্ণেন্দু দস্তিদারের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে 'স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম' (১৯৬৭), 'বীরকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার' (১৯৭০) ও 'শেখভের গল্প' (১৯৭০)।

চিন্তাহরণ ও মোহনবাসী : উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের প্রথম পাদে এই দুজন কবিয়াল চট্টগ্রাম অঞ্চলে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, খ্যাতিসম্পন্ন ও জনপ্রিয় ছিলেন।

পত্র : ষোল

তরজার লড়াই : পীর-মুরিদ বা গুরু-শিষ্যের তত্ত্বমূলক প্রশ্নোত্তর। উদ্দেশ্য জীবনের জটিল রহস্যের উন্মোচন। তরজা অনেক সময় ঢোল-কাঁসরের ব্যবহারে বিস্তৃত রূপেও পরিবেশিত হত।

রাধাকৃষ্ণ গান : রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক গান।

আড়ি : ষোল সেরে এক আড়ি। তবে এই সেরও পাল্লার পরিবর্তে সেরীতে মাপা হত।

গাজী গান : গাজী পীরের মাহাত্ম্য বর্ণনামূলক লোকগীতি। গানের পট-ভূমিতে পটচিত্রের ব্যবহার রয়েছে। গায়ক ও দোহার কর্তৃক পরিবেশিত ; ঢোল, খোল ও মন্দিরার ব্যবহার হয়।

পটি গান : পটুয়াদের গান। পারিতোষিকের বিনিময়ে গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী পট টাঙ্গিয়ে এই গীত পরিবেশিত হয়।

রামায়ণ গান : সঙ্গীতরূপে পরিবেশিত রামায়ণের গান।

গাজন : চৈত্র সংক্রান্তিতে পরিবেশিত শিব-সংক্রান্ত গীত।

জাগরণ পালা : সারারাত ধরে গাওয়া হয়। দেবদেবীর নিদ্রাভঙ্গ এই গানের উদ্দেশ্য।

বিষ্ণুপদি গান : বিষ্ণুর স্তুতিসূচক গীত। মথুরা-বৃন্দাবনের বৈষ্ণবদের রচনা। পঞ্চদশ শতক থেকে বঙ্গে প্রচলিত।

মাইজভাণ্ডার : চট্টগ্রামের নাজিরহাটের নিকটবর্তী মাইজভাণ্ডার নামক স্থানে কয়েকজন সুফীবাদী পীর প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। (দ্র. ভূমিকাংশ)

সারদা বাবু : রমেশ শীলের প্রতিবেশী সারদাচরণ শীল।

পুরুষ নির্বাক : মাইজভাণ্ডারের তৎকালীন পীর গোলাম রহমান।

৮ খানা বই : কবিয়াল রমেশ শীল প্রণীত "ভাণ্ডারে মাওলা", "আশেক মালা", "শান্তি ভাণ্ডার", "নূরে দুনিয়া", "সত্য দর্শন", "জীবন সাথী", "মুক্তির দরবার" ও "মানববন্ধু"।

রমেশ উদ্বোধন : ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

...দুর্ভিক্ষ : ১৯৪৩ সালের বঙ্গের দুর্ভিক্ষ, পঞ্চাশের মন্বন্তর নামেও পরিচিত।

বাগোয়ান : চট্টগ্রামের রাউজান অঞ্চলের একটি গ্রাম। এক সময় এখানে সুসংগঠিত কৃষক-আন্দোলন ছিল।

সুধী প্রধান : কলকাতার বিশিষ্ট প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। চল্লিশের দশক থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী লেখকদের সংগঠনে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য।

সংস্কৃতি সম্মেলন : ১৯৪৫ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী সম্মেলন।

ফণী বড়ুয়া : কবিয়াল রমেশ শীলের প্রধান শিষ্য। চট্টগ্রামের রাউজানের পাঁচখাইনে ১৯১৩ সালে জন্ম। শৈশবে পিতৃ-মাতৃহারা। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ মাত্র তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত। কৈশোরে ঘরবাড়ী ছেড়ে বৌদ্ধ মঠে আশ্রয় নেন। সেখান থেকে আরাকান হয়ে বর্মায় যান এবং ট্রাঙ্ক-কারখানায় চাকুরী নেন। কিন্তু দীর্ঘ প্রবাসজীবন তাঁর ভাল লাগে নি। ফিরে এসে পেশা হিসেবে বেছে নেন ঘড়ি মেরামতের কাজ। দোকান খুলেন কর্ণফুলী নদী-তীরবর্তী লাঙ্গুর হাটে। ত্রিশের দশকে যোগ দেন কবিয়াল রমেশ শীলের দলে। রমেশ শীলের মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর প্রতিটি কবিগানে ছিলেন ছায়ার মত সঙ্গী। পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে কবিয়াল হিসেবে তাঁর প্রতিষ্ঠা রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত। বর্তমানে বৃদ্ধাবস্থায় চট্টগ্রামে বসবাস করেন। তাঁর রচিত বইয়ের মধ্যে রয়েছে 'হাল জমানার গান,' 'জনতার গান', 'দেশের ডাক' প্রভৃতি।

রায় গোপাল : কবিয়াল রমেশ শীলের বিশিষ্ট শিষ্য। চট্টগ্রামের ধোরালায় জন্ম। কবিয়াল ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী।

গোমানী : শেখ গোমানী দেওয়ান। বীরভূমের জনপ্রিয় কবিয়াল ছিলেন।

লম্বদর : লম্বোদর চক্রবর্তী, গোমানীর প্রধান শিষ্য।

দারা : কবিগানের মূল বিতর্কের বিষয়।

পত্র : সতের

ভোটের গোলযোগ : ১৯৬৪ সালে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। ফিল্ড মার্শাল আইউব খান ও মিস্ ফাতেমা জিন্নাহ্‌র মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রমেশ শীল ফাতেমা জিন্নাহ্‌কে সমর্থন করেন।

...কৃষক সম্মেলন : ১৯৪৫ সালে অনুষ্ঠিত।

ঢাকা সাহিত্য সম্মেলন : ১৯৫৪ সালের ২৩-২৬ শে এপ্রিল অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন। সম্মেলনের লোকসাহিত্য-বিষয়ক অধিবেশনে রমেশ শীল সভাপতিত্ব করেন এবং এতে কবিগান পরিবেশন করেন।

নিরঞ্জন দাশ : রমেশ-শিষ্য। চট্টগ্রামের জলদীতে তাঁর আবাস।

ভারত : মহাভারত।

বার আউলিয়া : চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন স্থানে কবরস্থ বারো জন সূফী-সাধক। প্রচলিত লোকবিশ্বাস মতে তাঁরাই চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচার করেন।

সংবর্ধনায় ...লোকগীতি : ১৯৬৪ সালে চট্টগ্রামে রমেশ শীলকে প্রদত্ত নাগরিক সংবর্ধনা উপলক্ষে প্রকাশিত কবিয়ালের রচনা-সংকলন "লোকগীতি"।

আবেদন

কবি-সম্প্রদায় : কবিগানের দল।

তথ্যনির্দেশ

১. পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের রমেশ-চর্চার একটি মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা নিম্নোক্ত গ্রন্থে পাওয়া যাবে ঃ
সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ : "রমেশ শীল : অপ্রকাশিত কবিতাবলী", বাংলা সাহিত্য সমিতি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৪, পৃ. ১০২-১০৪

২. জীবন-পরিচয় রচনায় উৎসরূপে পৃথক পৃথক সূত্র নির্দেশ করা হয় নি। কবিয়ালের জীবনী তৈরীতে মূলতঃ নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে—
পূর্ণেন্দু দস্তিদার : "কবিয়াল রমেশ শীল", লালন পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৬৩
পুলক চন্দ : "গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তাঁর গান", কথাশিল্প, কলকাতা, ১৯৭৮
সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ : "রমেশ শীল : অগ্রথিত গীতিগুচ্ছ", ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৮৩
সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ : "রমেশ শীল, অপ্রকাশিত কবিতাবলী", চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩

৩. এই অনুচ্ছেদের তথ্যসূত্রের জন্য দ্রষ্টব্য—
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'কবি সংগীত', "রবীন্দ্র রচনাবলী", ষষ্ঠ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৬৫
সুকুমার সেন : "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস", মডার্ণ বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৪০
De, S.K. 'Chapter-X', "History of Bengali Literature in 19th Century" : Calcutta University, Calcutta, 1919

৪. তাঁর জীবনে কবিয়ালের শিল্পীদের নিয়ে বিভিন্ন সমিতি গঠনের মধ্যে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

৫. এর বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য—
সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ : "রমেশ শীল : অপ্রকাশিত কবিতাবলী", পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩-৪৩

৬. দ্রষ্টব্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩-৫৫

৭. দ্র. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (সম্পাদিত) "সাহিত্য পত্রিকা", ষড়্‌বিংশ বর্ষ : প্রথম সংখ্যা, ১৯৮৩, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৮. দ্র. আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত) "পাণ্ডুলিপি", বাংলা সাহিত্য সমিতি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

৯. পত্রের প্রাসঙ্গিক পরিচয় প্রদানকালে অপেক্ষাকৃত অপরিচিত ব্যক্তি ও ঘটনার উপর বিস্তৃত আলোকপাত করা হয়েছে। এ-সকল পরিচয় নিবন্ধকার বিভিন্ন সূত্র থেকে ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করেছেন। ফলে তাতে তথ্যগত ভ্রান্তি থাকা অস্বাভাবিক নয়।

জাতীয় পর্যায়ের ব্যক্তি ও ঘটনা-পরিচয় অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিসরে প্রদত্ত হয়েছে। বাহুল্য বর্জনই এর উদ্দেশ্য। এই পরিচয় তৈরীতে বিভিন্ন চরিতাভিধান ও কোষগ্রন্থ ব্যবহার করা হয়েছে।